বাংলার লোক-শিল্প

কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা
পুরোগামী প্রকাশনী

প্রকাশক
সুকুমার চৌধুরী
পুরোগামী প্রকাশনী
১০০/১ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ
কলিকাতা-৪

মুদ্রক
শ্রীমতী দেবী গুপ্ত
কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫ শান্তি ঘোষ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৩

পরম পূজনীয়

পিতা মাতার শ্রীচরণে

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

অধুনা বিলুপ্ত সিনেট ভবনের পশ্চিম অংশে তখন আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাকালের আরম্ভ থেকেই এখানে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রায়ই নিত্য নূতন সংবাদের আমদানি হ'ত আর তাই নিয়ে নূতন আবেগ ও উত্তেজনার সঞ্চার হ'ত। এই সব সংবাদের উপকরণ ছিল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা শিল্পদ্রব্যের নানা উপকরণ। এর কিছু ছিল গ্রামীণ শিল্পের নানা নিদর্শন। হাঁড়ি, সরা, পুতুল, কাঁথা, পট, পাটা এমনি কত তুচ্ছ জিনিস যা এর আগে কোনও মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় রাখবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি। অন্য অংশে ছিল অতীতের তৈরী নানা দেবদেবীর মূর্তি, অজ্ঞাত পরিচয় শাসকের তাম্রপট্টলী, পোড়ামাটির তৈরী নানা উপকরণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ ও খননের ফলে সংগ্রহ করা ঐতিহাসিক উপাদান। ক্রমে বাংলা অঞ্চলের ভুলে যাওয়া অতীত ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা যেমন স্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠল বাংলার লোকজীবনের একটা দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। ইতিমধ্যে দামোদরপুরে পাওয়া তাম্রপট্টলীগুলির পাঠোদ্ধারে গুপ্ত রাজাদের আমলের বাংলার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল; মহাস্থান গড়ের মৌর্য আমলের লিপি এই পরিচয়কে আরও পেছনে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। বানগড় থেকে শুঙ্গ আমলের পোড়ামাটির পুতুল আর পোখড়ণা থেকে পাওয়া যক্ষিনীর মূর্তি এসে সে যুগের ইতিহাসে নূতন উপকরণের সন্নিবেশ করল। একদিকে যেমন ইতিহাসের উপকরণ দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে লাগল তেমনি লোক-শিল্পের নানা উপকরণ সাধারণ মানুষের জীবনের এক উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরল দর্শকের চোখে। ইতিপূর্বে দীনেশ চন্দ্র সেন এবং গুরুসদয় দত্ত পথিকৃৎরূপে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহ তাকে পরিপূর্ণ করে তুলবার পথে অগ্রসর হল।

বাল্য ও কৈশোরে গ্রামীণ বাংলার দিকচক্র সীমায়িত আকাশ আর বিচিত্র পূজা উৎসব মেলা পার্বণের মাধ্যমে যে বাংলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আশুতোষ মিউজিয়ামের এই উদ্দীপনাময় পরিবেশে তার এক নূতন রূপান্তর ঘটল। নূতন করে যেন আবার এই বিস্তৃত বঙ্গভূমির সঙ্গে পরিচয় হল যেখানে দীর্ঘদিনের এক ভুলে যাওয়া সভ্যতার উত্তরাধিকার আজও

প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা ছিল সাধারণ মানুষের জীবন প্রণালীতে চিন্তা ও কল্পনায় যার ছোঁয়া লেগেছিল তার প্রত্যহের ব্যবহারের নানা উপকরণে লোক-শিল্পের নানা জিনিসের মধ্যে। সংগ্রহশালার অন্ধকার কক্ষে বসে তখন বাংলা সম্বন্ধেই চিন্তা করতাম; এই সময়েই বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলি প্রবন্ধ লেখা হয়। পুরোগামীর উৎসাহী বন্ধুরা যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে নানা সাময়িকীর পাতা থেকে প্রবন্ধগুলিকে উদ্ধার করেছিল। প্রবন্ধগুলি নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময় লেখা হওয়ায় এগুলির মধ্যে এক আধটুকু পুনরুক্তি দোষ রয়ে গিয়েছে, তাছাড়া হয়ত উচ্ছ্বাসেরও কিছু আধিক্য আছে, তবে মূল বক্তব্য প্রত্যক্ষ ও যুক্তি নির্ভর একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই। আজ প্রত্যহের ব্যবহারে দৃষ্টি ও স্পর্শের গণ্ডীর বাইরে চলে গিয়ে লোক-শিল্পের উপকরণগুলি সংগ্রহ-শালায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বাংলার নিজস্ব মনন কল্পনার, জীবনকে উপলব্ধি ও উপভোগ করবার যে পরিচয় দেখা যায় তা কখনও বিস্মৃত হবার নয়। এই সব উপকরণ বাংলা সম্বন্ধে দরদ ও অনুভূতিকে নিবিড়তর করে প্রতিবেশী মানুষ সম্বন্ধে সহানুভূতি ও ভালবাসা অধিকতর সহজ ও ঘনিষ্টতর ক'রে তোলে। বাংলাকে ভাল করে চিনবার পক্ষে লোক-শিল্পের উপকরণগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। এই ভরসাই প্রবন্ধ গুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রগুলির অধিকাংশই আশুতোষ মিউজিয়াম থেকে সংগৃহীত। বইটি প্রকাশের যদি কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে তা পুরোগামীর বন্ধুদের, দোষ ত্রুটি সবই আমার। পাঠকেরা নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

আশুতোষ মিউজিয়াম
"দীপাবলী"

কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
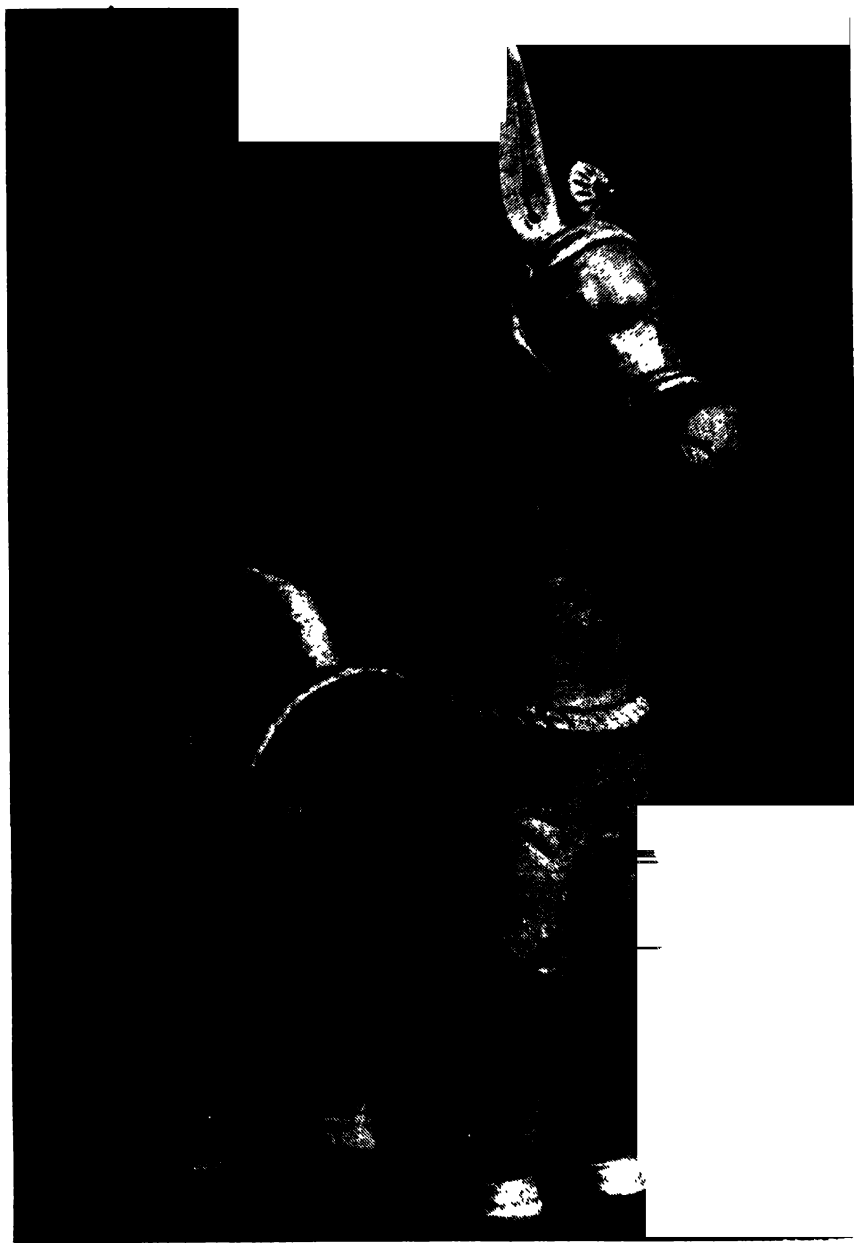
পোড়া মাটির ঘোড়া—বাঁকুড়া

কৃষ্ণলীলা পট

লোক-শিল্পের পটভূমি

দিগন্ত বিস্তৃত ধান খেত, শিথিল গতি বিশালকায় নদী, ঝোপ জঙ্গল বৃক্ষলতা এই নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ। ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাসে এখনও ভাল করে স্বাক্ষর পড়ে নি বাংলার প্রাচীন কাহিনীর। কবে এখানে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়েছিল! কা'রা ছিল এখানকার প্রাচীন অধিবাসী। ইতিহাসের অরণ্যপথে হারিয়ে যাওয়া সেই ইতিবৃত্তের অন্বেষণের আজও শেষ নাই। আরম্ভের কথা তাই ভাসা ভাসা; একটু একটু করে তৈরী হচ্ছে অতীতের পরিচয়; জানা না জানার ছোঁয়ায় কল্পনার বিস্তৃতির সুযোগ অপরিমিত।

বাংলার চলতি জীবনের ছাপ মঙ্গলকাব্যের যুগ অতিক্রম করে তাম্রপট্টলীর পথ বেয়ে যেখানে গিয়ে থেমেছিল সেখানকার আকাশ ধরা দিয়েছিল প্রচলিত রূপকথায়, উপকথায়। এই সব উপকরণের মাধ্যমে পরিচয় হচ্ছিল আমাদের সমাজ জীবনের পটভূমির সঙ্গে। এই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ছিল ব্রাহ্মণ, বণিক আর সাধারণ লোক; রাজা আর তার শাসন ব্যবস্থা ছিল এই সমাজের পরিপূরক। প্রকৃতির প্রাচুর্য থেকে অপরিমিত রস আহরণ করে নিরুদ্বেল জীবনের পসরা সাজিয়ে তুলেছিল বাংলার সমাজ। তাম্রপট্টলী আর শিলা-লেখ অতীতের দিকে যেতে যেতে যেখানে এসে মৌনতা লাভ করেছিল, সেইখান থেকে নূতন পাতায় লেখা আবিষ্কৃত হচ্ছে আজ তমলুকে আর সাগরদ্বীপে, হরিনারায়ণপুরে আর বেড়াচাঁপায় এবং আরও অনেক অনেক জায়গায়। এই লেখন অক্ষরের বন্ধন ছেড়ে প্রকাশ পাচ্ছে নিত্য ব্যবহারের তৈজস পত্রে, মাটির হাড়িকুড়িতে আর পোড়ামাটীর ফলকে, চিত্রে। রূপকথার কল্পনার আকাশ যেন রহস্যের ছায়াঘন আবরণ ছেড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে অস্তিত্বের বাস্তবতায়। বাংলার ইতিহাস রচনার প্রয়াসের আজ যুগসন্ধি।

ইতিহাসের উপকরণ সন্ধানে অগ্রসর হলে প্রথমেই মনে হয় সাহিত্যের কথা। একথা সকলেই জানে যে ভারতবর্ষের কোন লিখিত ইতিহাস নাই। ইউরোপীয় আদর্শে লেখা ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি অতীতের ভারতবাসী। বেদ আর পুরাণ, মহাভারত আর রামায়ণে যেটুকু ইতিহাসের কথা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল তারা; তবে তার চেয়েও কিছু বেশী জানত তারা। এখানে ওখানে সেই অতীতকে জানার পরিচয় আছে। বেদ আর পুরাণে রামায়ণ বা মহাভারতে ছাড়াও বৌদ্ধ আর জৈন সাহিত্যে এই অতীত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়; পাওয়া যায় নাটকে, কাব্যে, গদ্য রচনায়, শিলালেখে এবং তাম্রপট্টলীতে। কিন্তু ভারতের এই বিস্তৃত সাহিত্যে বাংলা কিন্তু নিতান্তই অবজ্ঞাত। শুধু কি বাংলাই। বেদের জ্ঞানের পরিধি ত পশ্চিম পাঞ্জাব। ব্রাহ্মণের আমলে এই পরিধি মগধ-বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে; কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা ব্রাহ্মণের রচয়িতাদের কাছে অতীতের গণ্ডীর বাইরে। এখানকার অধিবাসীদের পক্ষী বলে উল্লেখ করা হয়েছে দেখে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন যে বাঙ্গালীদের দেখা হয়েছে অবজ্ঞার চোখে।

এই উল্লেখ থেকে মনে হয় অবজ্ঞার কিছু ইঙ্গিত থাকলেও এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সংস্কৃতিগত বৈষম্যের ইঙ্গিতই হয়ত মুখ্য। সে যুগের মানুষ খণ্ড খণ্ড সমাজে বাস করত; এইসব খণ্ড সমাজ বা জাতিগুলির (tribes) পরস্পরের সঙ্গে সখ্যতা আর শত্রুতা এই দুইয়েরই সম্বন্ধ ছিল। তবে বেদ ব্রাহ্মণ ইত্যাদির রচয়িতারা মনে হয় সযত্নে অন্য সমাজ সম্পর্কে সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন। এই ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক সংবাদই বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা বিহিত হয়েছে ভিন্ন ভাষায় (অন্যবাচ); ভিন্ন সমাজের লোকেরা ভিন্ন দেবতার পূজা করত সেই সূত্রেও তারা ছিল ভিন্ন (অন্য দেবাঃ)। এই ভিন্ন ভাষার রূপ কি ছিল এবং যে ভিন্ন দেবতার পূজা করত তারা তাদের সুস্পষ্ট পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া

যায় না। কিন্তু এই ভাষা এবং দেবতা সম্বন্ধে ইঙ্গিতেরও কিছু অভাব নাই। ঋগ্বেদে পণি নামে এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়; বেদপন্থীদের সঙ্গে তাদের হৃদ্যতা ছিল না; হয়ত পণিরা স্বতন্ত্র দেবতার পূজা করত। নাগ এবং সুপর্ণ (বা পাখী) নামে পরিচিত অধিবাসীদের কথাও বেশ প্রাচীন সাহিত্য থেকেই জানা যায়। কালক্রমে এই নাগ আর সুপর্ণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র জাতি বলে পরিগণিত হতে থাকলেও এরাও যে মানুষই ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! এইখানে টোটেম (Totem) উপাসনার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। নাগরা যে সাপকে টোটেমরূপে পূজা করত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সর্পপূজক নাগ জাতি ভারতে বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল; ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এদের অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী কুরুসম্রাট্ পরীক্ষিতকে হত্যা করে নাগরা কুরুদের প্রাধান্য খর্ব করতে চেষ্টা করেছিল; জনমেজয় নাগ জাতির রাজধানির তক্ষশিলা বিধ্বস্ত এবং নাগকুল প্রায় ধ্বংস করে পরীক্ষিতের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। মহাভারতের এই কাহিনীর নাগজাতি যে সাপ নয়, 'মানুষ' এ অভিমত কিছু নূতন নয়। রামায়ণের বানর এবং ভল্লুক সম্প্রদায় ও যে যথাক্রমে বানর এবং ভল্লুক 'টোটেমের উপাসক' মানুষ এ অভিমতও আজ সুপরিজ্ঞাত। এইসব কাহিনী থেকেই অনুমান হয় যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বর্ণনার পক্ষীজাতীয় বঙ্গ ও মগধের অধিবাসীরা কোন পক্ষী টোটেমেরই উপাসক ছিল।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত পক্ষী টোটেমগুলির মধ্যে গরুত্মন্ বা গরুড়, হংস ইত্যাদিই ছিল প্রধান। এগুলি প্রধানতঃ সূর্যের সবিতৃর বা অগ্নির প্রতীক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হংসকে ইন্দ্রেরও প্রতীকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে ইন্দ্র অন্যতম আদিত্য বা সূর্যেরই প্রতিরূপ। কিন্তু ইন্দ্র প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্যে বৃষরূপেই পরিকল্পিত হয়েছিল। অবশ্য বৃষও ক্ষেত্রবিশেষে আদিত্যের প্রতীক। যাই হোক প্রতীক হিসেবে পক্ষী

প্রধানত সূর্যের অনুকল্প রূপেই উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী যুগে বাংলাদেশে গরুড় বাহন বিষ্ণু ময়ুর বাহন কার্তিকেয় খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অবশ্য গরুড়-বিষ্ণু এবং কার্তিকেয় দুইই পুরাণের যুগ থেকেই (খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দী) খুব বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এর আগে বাংলায় সূর্যের প্রতীকরূপে কোন্ পক্ষীর বিশেষ সমাদর ছিল বলা সহজ না।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর যখন বাংলার অন্তর্ভুক্ত বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন তখন নগরীর অধিবাসীরা নগ্নতাপস মহাবীরকে যে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে তার বর্ণনা আছে; মহাবীরের প্রতি বিরূপ সম্বর্ধনা জ্ঞাপনে ক্ষুব্ধ জৈনধর্মাবলম্বীরা রাঢ়দেশের অধিবাসীদের প্রতি বিশেষ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন। তবে নগ্নদেহ নিয়ে রাজপথে বিচরণ যদি রাঢ়ের নাগরিকেরা পছন্দ না করে থাকেন তবে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় কি? এ কথা এই প্রসঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে যে নাগরিক সভ্যতা রাঢ়দেশে কিছু কম ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও জৈন গ্রন্থাদিতে রাঢ়দেশ সম্পর্কে আর কোন সংবাদ পরিবেশন করা হয় নাই; বুদ্ধদেব ত' মগধের পূর্বে পদার্পণই করেন নাই। সমগ্র পালি সাহিত্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সংবাদের স্বল্পতা সত্যই বিস্ময়কর। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ কোন কৌতূহল নাই। একমাত্র দণ্ডীর দশকুমার চরিতেই বাংলার অন্তর্গত তাম্রলিপ্তির সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। মহাভারতের রচয়িতারাই সর্বপ্রথম বাংলা সম্বন্ধে বিস্তৃততর পরিচয় রেখে গিয়েছেন; তার পরেই উল্লেখ করা যেতে পারে কালিদাসের কথা; রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে সমুদ্র তীরবর্তী বঙ্গজাতির যে প্রবল প্রতিরোধের বিবরণ কালিদাসে পাওয়া যায় তা থেকে বঙ্গজাতির বীরত্ব এবং স্বাধীনতা প্রিয়তাই সূচিত হয়ে থাকে। গুপ্তরাজাদের আমলে বাংলায় যে সুবিন্যস্ত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বিখ্যাত দামোদরপুরের তাম্রপট্টলীগুলিতে তার পরিচয়

পাওয়া যায়। গুপ্তোত্তর যুগ থেকে বাংলা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এক সময় বাংলার ইতিহাস রচনা করতে সুবিখ্যাত কনৌজ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্কের কথা দিয়েই আরম্ভ করা হত। ক্রমে অপেক্ষাকৃত অতীতকালের কথাও জানা যাচ্ছে নানা উপকরণ থেকে; এইসব উপকরণের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণই প্রধান। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই প্রাচীনকালের অনেক ধ্বংসাবশেষ, বড় ছোট দীঘি ঘন জঙ্গলে ঢাকা উঁচু নীচু ঢিপি এই রকম সব পুরাকীর্তির নিদর্শন দেখা যায়। (ভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ি মাটির পুতুলের টুকরো দু'একটা পুরোনো রূপো কিম্বা তামার মুদ্রা প্রায়ই এইসব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরিয়ে এইসব কীর্তিগুলির উপর সাধারণের কৌতূহলপূর্ণদৃষ্টি আকর্ষণ করে।) প্রাচীন কিম্বদন্তীরও কিছু অভাব নাই এই সমস্ত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে। তবু উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে খোঁজা বা খোঁড়ার কাজ হয়েছে বাংলাদেশে খুবই কম; কারণ এই ধারণাই পণ্ডিত মহলে প্রায় বদ্ধমূল যে অর্বাচীন বাংলা অঞ্চলে প্রাচীন কীর্তির অস্তিত্ব খুব বেশী নাই; যদিওবা থেকে থাকে তবে পালযুগ থেকে পুরোনো আমলের ত' নয়ই। এই ধারণায় প্রথম আঘাত পড়ে 'দিনাজপুরের কাছে দামোদরপুর থেকে পাওয়া গুপ্তযুগের পাঁচখানা তামার পাতে লেখা অনুশাসন থেকে। এইসব অনুশাসনগুলি থেকে তৎকালীন বাংলায় প্রচলিত সুবিন্যস্ত শাসন ব্যবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা পণ্ডিত সমাজকে বাংলার সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নূতনভাবে সচেতন করে তোলে। এরপর আবিষ্কৃত হয় বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় থেকে মৌর্য হরফের ব্রাহ্মিতে 'লেখা একখানি শিলালেখ। এই শিলালেখ থেকে প্রমাণ হল যে মহাস্থানগড় সুপ্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির রাজধানি পুণ্ড্রনগরেরই ধ্বংসাবশেষ। ইতিহাসে পুণ্ড্রদের অস্তিত্বের প্রাচীনতা এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মনে হয় যে একদিন মহাভারতে উল্লিখিত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ইত্যাদি

জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও আবিষ্কৃত হতে পারে।

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর থেকে যেদিন বেশ উঁচু একটা জঙ্গলে ঢাকা মাটির ঢিবি থেকে সম্রাট ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান আবিষ্কৃত হল, সেদিন বাংলার ইতিহাস সন্ধানীদের মহলে বিস্ময় কিছু কম হয়নি। এখানকার সর্বতোভদ্র ধরণের মন্দির ভারতের ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কারণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে ব্রহ্মদেশে এবং যবদ্বীপে যে ধরণের বৌদ্ধ মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশ এই পাহাড়পুরের মন্দিরেরই আদর্শে নির্মিত।) যে দেশ থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এই আদর্শ পরিগৃহীত হয়েছিল সেই দেশে পাহাড়পুরের মন্দির ছাড়া এই আদর্শের আর কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন আজ পর্যন্তও পাওয়া যায়নি। (পূর্ব ভারত তথা বাংলাদেশের সঙ্গে এক সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে খুব নিকট যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত ছিল পাহাড়পুরের মন্দিরটি তার অন্যতম নিদর্শন।) এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে; দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রোপকূলে কিছুদিন পূর্বে একখানি শিলালেখ পাওয়া যায়; এই লেখখানিতে ভারতভূমিতে অবস্থিত রক্তমৃত্তিকা বিহারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন একজন নাবিক; নাম মহানাবিক বুধগুপ্ত। অনেকে এই নাবিককে বঙ্গদেশের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের অধিবাসী ছিলেন বলে অনুমান করেন। বাংলার প্রচলিত সংস্কারে, উপকথা ও কিম্বদন্তীতে বাঙ্গালীর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার মন্দিরের নক্সার সঙ্গে সুদূর ব্রহ্মদেশ এবং যবদ্বীপের মন্দিরের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে, মালয় উপদ্বীপের সাগরোপকূলে বাঙ্গালী নাবিকের উপস্থিতির পরিচয় পেলে কিম্বদন্তীর কাহিনীগুলিকে আর সম্পূর্ণ অলীক বলে মনে হয় না। (সুদূর অতীত কাল থেকে পালরাজাদের রাজত্বকাল পর্যন্ত বাংলার সঙ্গে বাহিরবিশ্বের

যে যোগাযোগ ছিল এ অনুমান করা খুব অন্যায় নয়। পালযুগের পরেও বাংলার সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই।)

এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব; তবে এই ধারণা খুব সুস্পষ্ট নাও হতে পারে। কবে নদীবিধৌত নরম পলিতে গড়া এই বঙ্গভূমিতে মানুষের বসবাস আরম্ভ হয়েছিল নিশ্চিতভাবে তা বলা যায় না। (বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জে, ছোটনাগপুর অঞ্চলে, বাঁকুড়ার পশ্চিমে নব্যপ্রস্তরযুগের মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে।) কিন্তু উত্তর পূর্ব বা দক্ষিণ বাংলার সংবাদ কম। ইতিপুর্বে মহাস্থানগড় থেকে মৌর্য আমলের লেখা পাওয়ায় মহাস্থানের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে দিনাজপুরের বানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে শুঙ্গযুগের পোড়ামাটির পুতুল এবং আরও নানা উপকরণ পাওয়া যায়। মহাস্থান থেকেও পোড়ামাটির পুতুল বেরিয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে পাটনা, বসার, (প্রাচীন বৈশালী) সেটমাহেট, মথুরা, এবং কৌশাম্বী ইত্যাদি অঞ্চল থেকেও বহু পোড়ামাটির মূর্ত্তি, পুতুল এবং আকৃতি খচিত ফলক বেরিয়েছে।) বাংলা থেকে এই ধরণের মাটির জিনিষ পাওয়ায় প্রমাণ হয় খুব প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে একই ধরণের পোড়ামাটির কাজের প্রচলন হয়েছিল। এই ধরণের পোড়ামাটির পুতুলের ব্যবহার ছিল সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন এই পোড়ামাটির মানুষ বা পশুর আকৃতির পুতুলগুলি হয়ত ছেলেমেয়েদের খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হত; আবার গৃহসজ্জা বা ব্রতপালণের জন্যও এগুলি লাগত।)

(বানগড়ের অনুরূপ পুতুলের সন্ধান এলো এর পর তমলুক থেকে; কিছুদিন আগে এই তমলুক থেকেই অদ্ভুত ধরণের কয়েকটি মাটির পাত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। গড়ন এবং অন্যান্য বিশিষ্টতা থেকে এই পাত্রগুলিকে বিশেষজ্ঞেরা খ্রীষ্টের জন্মের হাজার বছরেরও

আগেকার বলে অনুমান করায় বাংলা সম্বন্ধে অনুরাগী মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে। তবে কি খ্রীষ্টজন্মের বহু আগে থেকেই বাংলায় জনবসতি রয়েছে। আশ্চর্য কি, হয়ত জানা যাবে যে ঐতিহাসিকদের এতদিনের অনুমান সত্য নয়। হয়ত জানা যাবে যে পলিমাটিতে গড়া বাংলাদেশেও বহু আগে থেকেই শুধু জনবসতিই নয় সভ্যতারও অস্তিত্ব রয়েছে। ইংরাজ আমলের গোড়ারদিকে পোড়ামাটির বিচিত্র অলঙ্কার ও বেশভূষামণ্ডিত একটি নারীমূর্ত্তি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড সহরের আসমোলিয়ান যাদুঘরে সংগৃহীত হয়েছিল। এখন প্রমাণ হচ্ছে যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এই নারীমূর্তি তমলুক থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ব বিভাগ তমলুকে কিছু খোঁড়ার কাজ করেন এবং তাতে অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এই পোড়ামাটির মূর্তিগুলিকে আকৃতিগত এবং নির্মাণকৌশলের বৈশিষ্ট্য বিচারে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়। তমলুকের সন্নিকটে অবস্থিত আরও কয়েকটি জায়গা থেকেও সুন্দর সুন্দর মাটির পুতুল পাওয়া গিয়েছে।

তমলুকে প্রত্নতাত্বিক অনুসন্ধান নানা কারণে আর অগ্রসর হয়নি তবে এককালে তমলুক যে সভ্যতা সমৃদ্ধ জনবহুল নগরী ছিল তার প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হয়ত এই তমলুকই অতীতের তাম্রলিপ্তি যেখান থেকে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা বোধিবৃক্ষ নিয়ে সিংহল গিয়েছিলেন। সেই বন্দরে আসত দূর দূরান্তর থেকে বহু দেশ ও বহু জাতির পণ্যতরণী। কিন্তু প্রাচীন তাম্রলিপ্তের পূর্ণ মহিমা আজও আমাদের অজ্ঞাত। তমলুক থেকে দৃশ্যপটের অপসারণ হয়েছে বেড়াচাপায়। বেড়াচাপা কলকাতা থেকে বাইশ মাইল পূর্বোত্তরে। বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল বেড়াচাপার মজে যাওয়া পরিখা আর উঁচু মাটির স্তূপ দেখিয়ে লোকে বলে আসছিল চন্দ্রকেতুর গড়। স্থানীয় কিংবদন্তী রাজা চন্দ্রকেতু ও মুসলমান পীরকে

জড়িয়ে যে বিচিত্র কাহিনী বুনে তুলেছিল তাই নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা সন্ধ্যার বিশ্রম্ভালাপ করত। কিন্তু গ্রামবাসীদের নিস্তরঙ্গ জীবনে আলোড়ন উঠল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার তরফ থেকে এখানে আরম্ভ হল প্রত্নতাত্বিক অনুসন্ধান। কিংবদন্তীর খনামিহিরের ভিটে থেকে আবিষ্কৃত হল বৃহদায়তন ইষ্টকনির্মিত অট্টালিকা; হয়ত কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। খুব বেশী পুরোনো না হলেও গুপ্ত আমলের ত' নিশ্চয়ই!) তবে আরও বিস্ময়ের জিনিষ আসতে লাগল চাষের খেত আর খোলা মাঠ থেকে! এই সব জিনিষের মধ্যে পোড়ামাটির পুতুল দাঁড়াল সবচেয়ে বেশী; আর এল হাঁড়ি-কুঁড়ি, গয়না, পুঁতি মানুষের প্রত্যহের ব্যবহারের নানা উপকরণ। কতদিনের সহর এই বেড়াচাপা! প্রাচীন নাম কি ছিল এর? কে দেবে এইসব প্রশ্নের জবাব। হয়ত বেড়াচাপা নিজেই দেবে একদিন, নামলেখা কোন মাটির হাঁড়ি বা শীলামোহর বা তাম্রপট্টলীর গায়। আজ ঘুমোক এই গুড়িয়ে যাওয়া সভ্যতার আশ্রয় নিশ্চিন্তে; পণ্ডিত আর গবেষকরা নিয়ে এসেছেন সেখানকার উপকরণ তাদের টেবিলে, আর সাজান হয়েছে সব আশুতোষ মিউজিয়ামের গ্যালারীতে। কিন্তু এই অজস্র পোড়ামাটির পুতুল আর মূর্তি রথ আর ফলকের গায় যে পরিচয় লেখা আছে তার পাঠোদ্ধারে কাটছে নিদ্রাহীন রজনী অনেক অনুসন্ধিৎসুর। অনেক কথাই আজ সুস্পষ্ট, হয়ত কিছু এখনও রয়েছে আলো-আঁধারের রহস্যে। এমনি রহস্যে ঘেরা শিলমোহর আছে কয়টি। একটির গায় আছে একটি বিচিত্র ধরণের লিপি—ব্রাহ্মীলিপির একটি অনুলেখের পাশেই। আরও আছে কয়েকটি; তার মধ্যে ক্রীটের প্রচলিত শিল্পধারায় যে ধরণের মানুষের মূর্তি দেখা যায় তারই অনুরূপ গড়নের একটি মানুষের মূর্তি।

পরম বিস্ময়কর এই উপকরণগুলি ভাবিয়ে তুলেছে পণ্ডিতদের। অনায়াসে বিজ্ঞের মত আর বলা চলছে না বাংলার পলিভূমিকে

অর্বাচীন সাম্প্রতিক যুগের আবাসস্থল। তবে কি মৌর্য যুগেরও আগে, খ্রীষ্টজন্মের সহস্র বৎসর পূর্বেও বাংলায় জনবসতি ছিল, ছিল সভ্যতার অবস্থান! বাংলার পুরাবৃত্ত কি আজ সত্যই যুগ-সন্ধিক্ষণে সমাসীন। শুধু বেড়াচাপাই নয়, কলিকাতার সন্নিধানে ডায়মণ্ড-হারবারের হরিনারায়ণপুরে, ২৪ পরগণার বোড়ালে সুপ্রাচীন যুগের জনবসতির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ি আর নানারকমের মাটির পুতুল; সেইসঙ্গে অগুন্তি নানারঙের পাথরের পুঁতি। এই উপকরণ থেকে একটা হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার পরিপূর্ণ পরিচয় গড়ে তোলা সম্ভব কি? তবু যতটুকু পারা যায় তাই নিয়েই ত গড়তে হবে। একটু দেখবার চোখ একটু কল্পনার প্রসার থাকলে খুব কষ্টসাধ্য হবে না, নিয়ে আসা সেই হারানো দিনের রেশ! মাটির হাঁড়িকুঁড়িগুলির কত না আকৃতি! তবে এর মধ্যে কিছু কি আবার সুদূর রোমের তৈরী! অন্তত পণ্ডিতেরা ত তাই অনুমান করেন সূক্ষ্ম গোলগোল দাগকাটা কালো রঙের পাৎলা এক ধরণের হাঁড়ির টুকরো থেকে। রুলেট নামে পরিচিত এই অলঙ্কার খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে রোম অঞ্চলেই বহুল পরিমাণে নির্মিত হত; অন্য কোথাও ঠিক এই ধরণের হাঁড়ি তৈরি হয়েছে তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোম থেকে তবে কি সত্যই পণ্যবাহী জাহাজ আসত বিদ্যাধরীর উজান বেয়ে চন্দ্রকেতুগড়ের ঘাটে! খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই!

রুলেট পাত্র ছাড়া পশ্চিম জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সাক্ষ্য দিতে পারে চন্দ্রকেতুগড় থেকে এমন আরও কিছু প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এই যোগাযোগ যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জলপথে এ কথা অনুমান করবার কারণও রয়েছে অনেক। সেই সঙ্গেই তমলুক থেকে পাওয়া পোড়ামাটির একটা ডেলার উপরে খোদাই করা (গ্রীক হরফে লেখা) একটি লেখার কথা বিবেচনা করলে বাংলার সঙ্গে পশ্চিম জগতের সম্পর্ক অনুমান করা আর কষ্ট কল্পনা বলে মনে হয় না। এই যোগাযোগ কতদিন থেকে রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর

প্রসঙ্গে তমলুকে পাওয়া সুপ্রাচীন যুগের মিশরের ভাণ্ডের অনুরূপ মৃৎভাণ্ড দুটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যে কয়টি অদ্ভুত দর্শন মাটির মুদ্রিত গোলক পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে সুমেরীয় ধরণের মূর্তি ছাড়াও উঁচু গলুইওয়ালা সমুদ্রগামী নৌকার ছবি থাকায় স্বভাবতই বহু প্রাচীন যুগ থেকেই দূরদেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে যোগাযোগের ইঙ্গিতটি বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ এবং খনন পথে যে সব পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে পোড়ামাটির ফলক ও মূর্তিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। ফলকগুলি ছাঁচ থেকে তোলা ; এতে সে যুগের পোষাক-পরিচ্ছদ গয়নাপত্র সামাজিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফলকগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য এগুলিতে দেখানো নরনারীর শরীরের গঠন। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে যেসব নরনারীর অনুসরণে এইসব চেহারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল তাদের আকৃতি কেবল সুন্দরই ছিল না অত্যন্ত সুগঠিত ছিল। এইসব সুন্দর গঠন নরনারীর দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাজপোষাকের বৈশিষ্ট্যও কম উল্লেখযোগ্য নয়। পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই বেশ সূক্ষ্ম এক ধরণের কাপড় কোচাকাছা দিয়ে পরত। গায়ে থাকত ঐ কাপড়েরই উত্তরীয় ; কিন্তু উত্তরীয় পরবার কৌশলে দেহের গড়নের সুপূর্ণ ডৌল সহজেই প্রতীয়মান হত ; আর ছিল নানারকমের অলঙ্কার ; এই অলঙ্কারের বেশির ভাগই যে ছিল রকমারি পাথরের পুঁতিতে গাঁথা মালা তা বুঝতেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। অবশ্য রঙিন পাথরের নানা গড়নের পুঁতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলিতে বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং এ থেকে পুঁতির মালা পরবার যে খুবই প্রচলন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এই ফলকগুলিতে ছাপিয়ে তোলা নানা দৃশ্য হয়ত সেকালে প্রচলিত জনপ্রিয় নানা কাহিনীর ছবি ; এই কাহিনীগুলি হয়ত সাধারণের মধ্যে বেশ পরিচিত ছিল এবং জনচিত্ত মনোরঞ্জনের জন্য শিল্পীরা এইসব ছবি মাটির ফলকে ছাপিয়ে বিক্রি করত। তবে

কেবল চিত্তবিনোদন ছাড়া ধর্মীয় প্রকরণের সঙ্গেও কোন কোন ফলকের হয়ত সম্পর্ক ছিল। তবে একক মূর্তি বা নানা রকমের যে সব পশুমূর্তি আছে সেগুলির সঙ্গে সেকালে প্রচলিত ধর্মের হয়ত নিকট সম্পর্ক ছিল। হাতী, পাখাওয়ালা হাতী এবং হাতীতে চড়া মানুষের অনেক মূর্তি এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলগুলি থেকে পাওয়া গিয়েছে ; সেইসঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে ভেড়া বা ভেড়ার ওপরে বসা মূর্তি, ঘোড়ায় টানা রথের ওপরে বসা মূর্তি। এই মূর্তিগুলির আকার এবং বৈশিষ্ট্য দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে এগুলি হয়ত সে যুগে প্রচলিত নানা প্রকার দেবতারই মূর্তি ছিল।

এইসব ফলক, একক মূর্তি এবং পশু ও পশুবাহিত মূর্তিগুলিতে একদিকে যেমন রূপ কল্পনা, শিল্পবোধ এবং নির্মাণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে এগুলি থেকে সে যুগের সমাজ ও সমাজ-মনেরও একটা স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। উপকরণ হিসাবে মাটি নগণ্য হলেও এই মাটিকে নানা আকৃতিতে রূপায়িত করে তুলবার মধ্যে শিল্পীর কল্পনার প্রসারতার পরিচয় স্পষ্ট। পশু ও মানুষের মূর্তিগুলির গড়নে এবং দেহের ডৌলে, এগুলির দাঁড়াবার বা বসবার ভঙ্গী এবং ভাবোদ্দীপক বৈশিষ্ট্যে রয়েছে শিল্পীর দক্ষতা। কিন্তু সমাজচিত্র হিসাবে এগুলির মূল্য নিরূপণ করতে গেলে দেখা যায় এই কল্পনা প্রবণ এবং দক্ষ কারিগরেরা সে যুগের এই মৃৎশিল্পের মাধ্যমে এমন এক উপকরণ রেখে গিয়েছেন কৃতি সাহিত্যিকের পক্ষেও তার লেখনীর মুখে অনুরূপ তথ্যমুখর জীবন্ত সমাজচিত্র রেখে যাওয়া সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

বাংলা চিরদিনই সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্যে প্রসিদ্ধ ; এ প্রসিদ্ধি হয়ত সেই দু'তিন হাজার বছর আগেও ছিল। পরিধেয়ের মধ্যে ছিল গলার পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে দুই কাঁধের উপর দিয়ে দুদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া উত্তরীয় ; কখনও এই ভাঁজ করা উত্তরীয় কাঁধের উপর থেকে পিছলে হাতের কব্জির উপর এসে পড়ত। পুরুষরা মোটা উপবীত পরত বাঁ কাঁধ আর ডান হাতের তলা দিয়ে ; কোমরে

গ্রন্থী বেঁধে আঁটোসাটো করে কাছা দিয়ে ধুতি কাপড় পড়ত—নারী-পুরুষ উভেয়। ধুতির নিচের ভাঁজ এসে পৌঁছাত পায়ের প্রায় গিঁঠ পর্যন্ত, কেউ কেউ বোধ হয় আবার অতি সূক্ষ্ম কাপড়ের তলায় একটা খাট ঘাগরার মত অন্তর্বাসও পরত; কিন্তু কয়েক পল্লী কাপড়ের আবরণও দৃষ্টিকে রোধ পারত না—দেহের সুস্পষ্ট এবং কমনীয় ডৌল বস্ত্রাবরণ ভেদ করেও দেখা যেত—অন্তত মাটির মূর্তিগুলি দেখে এ বিশ্বাসই জন্মায়। এইসব নরনারী কারা! স্বাস্থ্যে এবং গঠনের সুসমঞ্জতায়, আবরণ এবং আভরণের বৈচিত্র্যে এবং বৈশিষ্ট্যে এবং ভাবভঙ্গী চলন ধরণের মার্জিত পরিবেশে এরা যে সভ্যতার পরিচয় বহন করে সে সভ্যতা কি এই বাংলাদেশেই বর্তমান ছিল?

এইসব পুতুলের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রাচীন যুগের কিছু মাটির বাসন-পত্রের পরিচয় ও প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলগুলি থেকে পাওয়া গিয়েছে। তমলুক থেকে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গড়নের মাটির পাত্র প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রন্ আর্টিবাস এসি নামক শিল্প সম্পর্কিত সাময়িকীতে প্রকাশ করলে প্রত্নতাত্ত্বিক জগতে একটু আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। কারণ এই ভাণ্ডগুলির সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় পাত্রের আকৃতির উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য; অবশ্য সে উত্তেজনা নূতন কোন আবিষ্কারের অভাবে স্তিমিত হয়ে আসে। পরে বাংলার প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত চন্দ্রকেতুগড় ও হরিনারায়ণপুর থেকে সুপ্রাচীন সংস্কৃতির ও রোমক জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কালো লাল গড়নের (Black aud red), উত্তরাঞ্চলীয় চক্‌চকে কালো মাটির (N. B. P.) এবং রুলেট করা পাত্র সংগ্রহ করে বাংলার মাটির পাত্রের সাহায্যে সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার পথ সুগম করেছেন। তাঁরই যত্নে গাঙ্গেয় অববাহিকা থেকে সিন্ধু-হরপ্পা সভ্যতার সমকালীন এবং সমগোত্রীয় উপকরণও সংগৃহীত হয়েছে। সুপ্রাচীন যুগের বাংলার সংস্কৃতির পরিবেশে ব্যাপকভাবে সমাজের সর্বস্তরের সঙ্গে পরিচয় তথা সেই যুগের সামাজিক

শিল্পরীতিরও কিছু পরিচয় আজ সহজলভ্য হয়েছে। এই শিল্প ছিল নিতান্তই লোকনির্ভর—এর উপকরণ সুলভতম মৃত্তিকা। গড়ন ডৌল ও সংবেদনে এই শিল্পের বিস্তৃতি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক।

কিছুকালের মধ্যে বাংলাদেশে শিল্পের গণ্ডীতে আভিজাত্যের ছাপ পড়ল। এই আভিজাত্যের আবির্ভাব হয়েছিল প্রথমে খুব সম্ভব পুরাণবিহিত দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে। উপকরণ হিসাবে এই শিল্পের অবলম্বন ছিল পাথর। সত্য কথা বলতে কি মাটি থেকে পাথরের প্রবর্তনেই এই নূতনত্বের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেলেও দেহ গঠনে এবং পৃষ্ঠপটের উপর মূর্তির বিন্যাসে এই নূতনত্বে মধ্যভারতের কুষাণ রাজাদের আমলের বিধিবিন্যাসের সঙ্গে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এই রীতির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় হাকড়াইলে পাওয়া বিষ্ণু মূর্তিতে। হাকড়াইলের পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও বেশ কয়েকটি মূর্তি বাংলাদেশে এই বিশিষ্ট রীতির ব্যাপক প্রচলনের পরিচয় দিচ্ছে।

অতঃপর পাথরকে অবলম্বন করে বিস্তৃততর শিল্পের প্রবর্তন হয়েছিল, গড়ে উঠেছিল বহু মঠ মন্দির বিহার। পুঁথির পাতায় আর পাটায় খচিত হয়েছিল বর্ণরঞ্জিত নানা ছবি। কিন্তু নির্মান কৌশলে বিধি বিন্যাসে এই শিল্প চলিত আবেদনের শিল্প থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে থাকে; গোড়াতে উত্তর ভারতীয় বিধি বিন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্যে পরে আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় এই শিল্প বাংলার অভিজাত বৈশিষ্ট্যকে বহন করে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। কুষাণ, গুপ্ত এবং পরে পালসেন যুগের পাথরে গড়া মূর্ত্তিতে এবং পুঁথিতে আঁকা ছবিতে বিধৃত হয়ে আছে এই শিল্পধারার স্রোতরেখা।

কিন্তু এই শিল্পের সঙ্গে সঙ্গেই সমান উদ্যমে যে আর একটি শিল্প ধারা চলেছিল তারও পরিচয় কিছু কম নেই। এই শিল্পধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা অবশ্যই সর্বদা সম্ভব নয়। প্রাচীনকালে প্রচলিত এই ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটে খ্যাতনামা পাল সম্রাট ধর্মপালদেবের প্রতিষ্ঠিত সোমপুর মহাবিহারের (বর্তমান পাহাড়-

পুরের) মন্দির প্রাচীরে। এখানে পোড়া মাটির তৈরী অসংখ্য ফলকে পাথরে তৈরী মূর্তি শিল্প থেকে স্বতন্ত্র ধরণের বিধিবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর দিক থেকেই এই শিল্পের আবেদন ব্যাপক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর নৈকট্যও ছিল খুবই নিবিড়।

পাহাড়পুরের পাথরের মূর্তিগুলিতে গড়ণের স্বাভাবিকতা, আননের মার্জিত অভিব্যক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লালিত্য তক্ষণ শিল্পের খুবই ঔৎকর্ষের পরিচয় থাকলেও গতির সাবলিলতায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়নের সংক্ষিপ্ত পারদর্শিতায় এখানকার পোড়ামাটির মূর্তিগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস ও অভিব্যক্তিতে সংক্ষেপ করবার এই কৌশলের মধ্যে শিল্পের আদিম রূপের পরিচয় থাকলেও এই শিল্প যে মানুষের হাতে বহু শতাব্দী ধরে বাহিত হয়েছে পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। আদিম ধর্মী শিল্প স্বাভাবতই জড়তাগ্রস্ত এবং নিজের ভারেই জড়তাগ্রস্ত ; পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে বিষয় বিন্যাসের সংক্ষেপনে কিন্তু এই জড়তার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না ; গতির সাবলীলতায় কথ্যবস্তু এখানে নিতান্তই মুখর। বাংলার চলিত শিল্পের ভিত্তির সন্ধান করতে হলে স্বাভাবিক ভাবেই পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এই ধরণের পোড়ামাটির কাজ পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার সাভারে, কুমিল্লার সন্নিকটবর্তী ময়নামতীতে। দিনাজপুরের বানগড়ে, মেদিনীপুরের পান্না আর তমলুকে এবং চব্বিশ-পরগণার কয়েকটি স্থান থেকেও পাওয়া গিয়েছে। এই সকল পোড়ামাটির কাজ থেকে মনে হয় বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলে প্রায় একই সময়ে এই বিশিষ্ট ধরণের শিল্প রীতির প্রচলন হয়েছিল। বাংলার বাইরে উত্তরপ্রদেশে ভিটা, কৌশম্বী ইত্যাদি জায়গায় দক্ষিণের গুণ্টুপল্লীতে এমনকি সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোন কোন অঞ্চল থেকেও প্রায় অনুরূপ ধরণের পোড়ামাটির কাজের সন্ধান থাকায় এই কথাই মনে হয়, যে ভারত খণ্ডের সর্বত্রই একটা বিশিষ্ট ধারার লোকনির্ভর শিল্প অনেকটা একই

চরিত্রে বিশিষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই শিল্পের সঙ্গে উচ্চ গ্রামের সভ্যতার বাহন মার্জিত ধর্মমতগুলি যেমন পুরাণাশ্রিত (হিন্দু) ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষসম্পর্ক ছিল না; কিন্তু আখ্যানভাগ সমৃদ্ধ লোকসমাজে প্রচলিত অতি বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীই যে এই শিল্পের উপজীব্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই লোক-কাহিনী নিয়ে যে শিল্প সুলভতম উপকরণের মাধ্যমে রূপ গ্রহণ করেছিল তাতে সাধারণ মানুষের ঘরের এবং পারিপার্শ্বিকের নানা পরিচিত উপকরণ, বহু বিচিত্র রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। আর সেই সঙ্গেই দেখা যায় এই শিল্পে মানুষ পশু-পক্ষীর প্রতিরূপের যেমন প্রাচুর্য্য বৃক্ষলতার তেমনই অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা। আর অলঙ্করণের জন্য রেখাবহুল জ্যামিতিক নক্সার ব্যাপক ব্যবহার।

বাংলার লোকশিল্পের ক্ষেত্রে এইসব গুণেরই অভিব্যক্তি দেখা যায়। উপকরণের ক্ষেত্রে বাংলার চলিতশিল্পী সুলভতম জিনিষের ব্যবহারেই উৎসাহী; তারে হাতে শিল্পের উপকরণ মাটি। ছেঁড়া পুরাণো কাপড় বা কাপড়ের সূতো আর সস্তা রং যেমন সিঁদুর, গিরিমাটি, ভূষো কালি আর তৈল। পাল ও সেন যুগের পোড়ামাটির কাজ ছাড়া চলিত শিল্পের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও সে যুগে যে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ব্যবহারিক সূত্রে গাঁথা বহু শিল্পোকরণের অস্তিত্ব ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। হয়ত একটা প্রবহমান চিত্র কল্পেরও প্রচলন ছিল, পরবর্তী যুগের যমপটের মধ্যে যার উর্দ্ধতন লক্ষ্য করা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতের উপরেই গড়ে উঠেছিল বর্ত্তমানের ক্ষীয়মান লোকশিল্পের বনিয়াদ। মৃৎ ভিত্তিক জনতার সংস্কৃতিতে ছিল সোঁদা মাটির গন্ধ; তাদের জগৎ ছিল, সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, ত্যাগ ও ভালবাসা ঘৃণা ও উগ্রতার সংমিশ্রণে সীমায়িত। ঘন বিন্যস্ত বনস্পতি ও ভেষজের আচ্ছাদনে বহুমুখী নদী স্রোতের পলিতে, প্রতিষ্ঠিত এই বাংলার জন চৈতন্যে বন ও নদীর পরিচয় তাই গৌণ। মানুষ

আর পশুর আগমন নিষ্ক্রমণের মধ্যে যে জীবন স্পন্দন তা হ'ল এই চলিতশিল্পের প্রাণ বস্তু। মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে পশুর যে সম্বন্ধ—মৈত্রীর এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতার তাই হল চলিত শিল্পের প্রধান উপজীব্য।

প্রথমেই দেখি জীবনের অভিপ্রকাশের নানা বৈশিষ্ট্যের প্রতি শিল্পীর গভীর সহানুভূতি ও কৌতূহলপূর্ণ আগ্রহ। এই কৌতূহল ও সহানুভূতি শিল্পীকে মানুষ ও পশুর জীবন ও বিচরণ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেছিল—মানুষ ও পশুর জীবনের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ যেভাবে এই শিল্পীর রচনার মাধ্যমে বিধৃত হয়ে আছে তা লক্ষ্য করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কত গভীর অনুভূতি, ভয়-ভক্তি, অনুরাগ, বিরাগ, আকর্ষণ, বিকর্ষণের আলেখ্যই এই আখ্যায়িকামূলক চিত্রগুলিতে পাওয়া যায়! পর্যবেক্ষণ ও উপভোগ করার কি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল ক্ষমতা! এই ধারার উত্তরাধিকার দেখি পরবর্তী যুগের মন্দির প্রাচীরের আখ্যানমূলক চিত্রসমৃদ্ধিতে। রামায়ন ও কৃষ্ণজীবন লীলাকে মুখ্য বিষয়বস্তুরূপে রেখে শিল্পী এইসব মন্দির প্রাচীরের আলেখ্যে জীবনবিন্যাসের কত বিচিত্র এবং ব্যাপকতাপূর্ণ চিত্রই না এঁকে রেখে দিয়েছেন। এই আখ্যায়িকাবলীই বাংলার চলিত শিল্পের রূপ-জগতের প্রধান উপজীব্য—সবচেয়ে গৌরবের ধন। এরই সঙ্গে সমগোত্রের সৃষ্টি রয়েছে পুতুলে আর খেলনায়, প্রতিমা আর মূর্তিতে ; মন্দির সম্ভারের আলেখ্যময় রূপ জগতের পাশে পরিপূরক হিসাবে এরাও আছে খণ্ডিত এবং সীমায়িত পরিবেশের মধ্যে—সীমাহীন কল্পনার জগতের আভাষ।

মন্দিরের প্রাচীরে ফুল ও লতাপাতার সঙ্গে জ্যামিতিক নক্সার অলঙ্কারেরও প্রাচুর্য দেখা যায় ; ফুল ও লতায় বিন্দু ও লীলায়িত রেখার প্রাধান্য ; জ্যামিতিক নক্সায় ঋজু ও পরস্পর ছেদমান রেখা কল্পনার বিস্তৃতিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রকাশ করেছে। এই ইঙ্গিতের ভাষা এক সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজবোধ্য ছিল

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গৃহগত নানা শিল্পে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের তৈজসপত্রের মধ্যে এসে এইসব নক্সা আশ্রয় নিয়েছিল একাধারে শোভা ও সৌকর্য বর্দ্ধনে অন্যদিকে ইঙ্গিতপূর্ণ রহস্যলোকের ছোঁয়ায়।

বিস্তৃত এবং ব্যাপক পরিবেশ ছেড়ে যেখানে শিল্প এসে ঘরের আঙ্গিনায় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে পা মিলিয়েছিল সেইখানেই হয়েছিল চলিত শিল্পের প্রতিষ্ঠা। শিল্প এখানে যে রূপ ও রুচি নিয়ে প্রত্যহের জীবনের ব্যবহারের জিনিষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিল, তার আবেদন অন্বেষণ করতে হলে নানা দ্রব্যের নানা উপকরণের মধ্যে সন্ধান করতে হয়। যে গৃহকে অবলম্বন করে এই গৃহগতশিল্প আত্মপ্রকাশ করেছিল আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে তার রূপবৈভবও কম ছিল না। উঁচু পৈঠার উপর পরিচ্ছন্ন নিকানো দেওয়াল—ওপরে চারিদিকে ঢালু চাল। বিস্তৃত চাষের জমির একান্তে ঘনবিন্যস্ত আম-জাম নারকেলের সারির মধ্যে শান্ত গৃহ-সরোবরের জলে ছায়াখানি বিছিয়ে দিয়ে গড়ান চালে ছাওয়া ঘরের এই রূপটি যে মায়ামোহের সৃষ্টি করত তার স্পর্শ আজ স্মৃতিতে পর্যবসিত। এই গৃহকে অবলম্বন করেই পরিবার ; পুরুষানুক্রমিক ছিল যার আকর্ষণ। সন্ধ্যায় প্রাঙ্গণের যে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ স্থাপন করে গৃহস্থবধূ শ্বশুর-কূলের কল্যাণ কামনা করত সেই মঞ্চের ধাপে-ধাপে ছিল ভূলোক, দ্যুলোক পিতৃলোক ইত্যাদি অতিক্রম করে অভিষ্ট গোলোকের ইঙ্গিত।

এই গৃহকে অবলম্বন করেই ছিল বাঙালীর জীবন ; এখানেই সে সন্নিবিষ্ট করেছিল তার ধ্যান ও কামনার সামগ্রী ; তার অভিলাষ ও কামনার সামগ্রী ; তার চিন্তা ও কল্পনার বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করত নিত্য ব্যবহার্য বহু সামগ্রীর মধ্যে।

সাধারণ বাঙালীর জীবনের সঙ্গে জড়িত উপকরণের খুব বাহুল্য ছিল না। পরিধানে পুরুষদের সাদা কাপড়, মেয়েদের নানা রকমের নক্সাদার শাড়ী ; পরিধেয় বস্ত্র পুরোনো হলে সেই বস্ত্র দিয়েই সেলাই

করে নেওয়া হত কাঁথা ; অধিকাংশেরই তুলোর লেপ জুটত না। একখানার ওপরে আর একখানা কাঁথা জড়িয়েই শীতের রাত কাটাতে হত। পরিবারের ঠাকুমা, দিদিমা অবসর সময়ে কাঁথা সেলাই করতেন আর সেইসঙ্গে অনেক সময় নানা বৈচিত্র্যময় কাহিনীর জাল বুনে শিশুদের মনে অপূর্ব মায়ামোহের সৃষ্টি করতেন। এইভাবেই কাঁথার নক্সার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল রূপকথার কাহিনীর একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ। বহু বিচিত্র বর্ণের সুতোতে সাদা জমির উপর এই কাঁথার গায়ে নানা নক্সা ফুটিয়ে তোলা হত ; এই নক্সার মূল বা কেন্দ্রে থাকত সহস্র দল পদ্ম ; তার চারদিকে ফুল, লতাপাতা, হাতীঘোড়া, পাল্কী, লোকলস্কর, এমনি কত নক্সা। এই নক্সাগুলির সঙ্গে খুব নিকট সাদৃশ্য দেখা যায় আলপনার নক্সার। ব্রতপার্বণ উপলক্ষে নিকোনো মেঝের উপর পিটুলী গোলা দিয়ে যে নক্সা আঁকা হত সেই নক্সাতেও অমনি প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুল, লতা, বাড়ী-ঘর গয়নাপত্র পাল্কী বেহারা দেখতে পাওয়া যেত। এই সাদৃশ্য শুধু আকৃতিগতই ছিল না। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও আলপণার সঙ্গে কাঁথার নক্সার যোগাযোগ ছিল ; আর এই আলপণার নক্সার অন্তর্নিহিত আবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় মেয়েলি-ব্রতের কথায়, আর উদ্দেশ্যে। এইসব ব্রতের কথায় আর বাংলার প্রাচীন উপকথা রূপকথায় কল্পনার যে বিস্তৃত প্রসারের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ইতিহাসেরও বহু উপাদান যে নিহিত রয়েছে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

কাঁথা আর আলপনার জগৎ থেকে গৃহগত-জীবনকে যাতে বাস্তবক্ষেত্রে খুব কিছু দূরে সরে আসতে না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই গড়ে তোলা হয়েছিল নিত্য ব্যবহারের নানা জিনিষের আকৃতি আর নক্সা ; পূজাপার্বণের আলপনা আর পুতুলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল চিত্রিত ঘট, পট, সরা আর কুলোর। পূজা উপলক্ষ্যে যে ঘটস্থাপন করা হয় তার ইঙ্গিত-গর্ভ রূপটি হিন্দুমাত্রেরই অজানা নয়। পূর্ণতার প্রতীক মঙ্গলের চিহ্ন এই ঘটের উদ্ভব সুপ্রাচীনকালেই ঘটেছিল ;

গৃহগত হলেও ঘটের ইঙ্গিতপূর্ণতার দিকটি উচ্চগ্রামের মনন কল্পনারই বস্তু। বাঙলার ঘটে এই ঘটের চিত্রময়তা এক অভাবনীয় রূপ গ্রহণ করে; বিশেষ করে বিভিন্ন অঞ্চলের মনসার ঘটের চিত্রময়ত্ব, ঘটের অঙ্গের সঙ্গে চিত্রের যে স্বাভাবিক সমন্বয়তার সৃষ্টি বাঙালী শিল্পীর হাতে ঘটেছিল তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। অনুরূপ কৌশলের এবং গভীর শিল্পবপ্রণতার পরিচয় পাওয়া যায় ব্রতোপলক্ষে ব্যবহৃত চিত্রিত সরায়। মাটির সরা নিত্য ব্যবহারেরই বস্তু; তার আকৃতিতে রূপের বিশিষ্টতাটি সুপরিস্ফুট। দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে গ্রহণের ইঙ্গিতটি বাঙলার সরার আকৃতির বৈশিষ্ট্য। এই আধারশক্তির মূলে দেবী শক্তির অস্তিত্বের আভাষটি সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্যই যেন বাঙ্গলার লোকশিল্পী সরার উল্টোপিঠটিকে পটরূপে দেবীর চিত্র রচনার জন্য নির্বাচন করেছিল। সরার পিঠ বাইরের দিকে কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু; এই বিশেষ ধরণের পিঠের উপর ছবি আঁকা সমতল ক্ষেত্রে ছবি আঁকার থেকে বেশ একটু শক্ত; এই ধরণের ক্ষেত্রের উপর আঁকা ছবির সঙ্গে ঘটের গায়ে আঁকা ছবির কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও সরার গায়ে আঁকা ছবির বিশিষ্টতা কিন্তু স্বতন্ত্র। মাঝখানে উঁচু, দুপাশে গড়িয়ে যাওয়া ক্ষেত্রের উপর রেখার হ্রস্ব-দীর্ঘের সামঞ্জস্য রেখে ছবি আঁকার সঙ্গে অশোকের আমলের সারনাথের প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষদেশের ঢোলকের আকৃতির অংশের বাইরের গায় উৎকীর্ণ মূর্ত্তিবিন্যাসের সামঞ্জস্য বোধ হয় খুব কষ্ট কল্পনার বস্তু নয়। সরার উপর দৈবীমূর্ত্তি যা দেখা যায় তার সবই লক্ষ্মী, দুর্গা ইত্যাদি নারীদেবতার মূর্তি; পুরুষদেবতার মূর্তি কখনও দেখা যায় না।

বিবাহ উপলক্ষে নানা প্রয়োজনে হাঁড়ি, সরা কুলো, পিঁড়ি ইত্যাদিও নানা নক্সায় অলঙ্কৃত করা হয়। এইসব নক্সায় বহুদল পদ্ম, শঙ্খলতা এবং জ্যামিতিক রেখার প্রাধান্য থাকে; উৎসবকে রঙ ও রেখার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করা ছাড়াও এইসব নক্সার মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ আবেদন ছিল যা আলপনা আর কাঁথার নক্সার ইঙ্গিতের
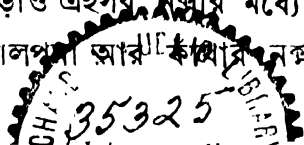
মতই ছিল সহজবোধ্য। এই ইঙ্গিত প্রবণতার সঙ্গে নিছক রূপদৃষ্টির পরিচয়ও সন্নিবিষ্ট হয়েছিল নিত্য ব্যবহারের নানা সামগ্রীতে। মিঠাইয়ের আকৃতি, মিঠাই গড়বার ছাঁচ, জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখবার পেটি, শিকে, বটুয়াগুলিও নানা নক্সা, নানা বর্ণের ছোপে উজ্জ্বল করে নেওয়া হত। এইসব উপকরণেও গৃহলক্ষ্মীর সংবেদনশীল রূপ দৃষ্টি এবং সুপটু রচনাকৌশলের সাক্ষ্য লক্ষ না করে পারা যায় না।

আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ বিচিত্র ও সীমাহীন আকৃতির সমষ্টি। দৃশ্যবস্তুর আকৃতি অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ দেখে রঙ; রঙ তাই আকৃতিকে পূর্ণতা দেয়; বর্ণসমৃদ্ধি দৃশ্যবস্তুর আকৃতিকে মহিমান্বিত করে। এই বর্ণ আর আকৃতি নিয়ে দৃশ্যমান জগতের পূর্ণতা। মানুষের কল্পনাও আকৃতি ও বর্ণকে সাবলম্বন করে নিজেকে বিস্তৃত করে, আপন সত্বাকে সঞ্চারিত করে দৃশ্য বস্তু সমাসৃষ্ট জগতে। আকৃতি বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অনুভবনীয় সত্বার সৃষ্টি করে তাকেই বলা চলে রূপ; এই রূপে আকৃতি এবং বর্ণের অতিরিক্তও কিছু থাকে, যাকে বলা চলে প্রাণ। এই প্রাণই মানুষ রূপের মাধ্যমে নিজের মধ্যে অনুভব করে; রূপই মানুষের জাগতিক উপভোগের মৌলিক ভিত্তি।

মানুষ নিজে যা সৃষ্টি করে তাকেও রূপভিত্তিক করে নির্মাণ করবার চেষ্টা স্বভাবতই দেখা দেয়। মানুষের মন সাধারণত স্পর্শপ্রবণ; পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তার উপরে অত্যন্ত প্রবল। আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রের মানুষ এই পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুবিন্যাসের দ্বারা প্রবল-ভাবেই প্রভাবিত হয়। এই প্রভাবের উপরেই গড়ে ওঠে তার রুচি। তার অনুভবশীলতা এবং সেই অনুভূতিকে রূপ দিবার ক্ষমতা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় তার শিল্প এবং তার জীবন। মানুষের শিল্পে এমন কি তার ব্যবহারিক দ্রব্যাদির আকৃতি ও বর্ণবিন্যাসে তাই মানুষের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সজীব ও অনুভূতি প্রবণ মন এই রুচিকে মার্জিত রাখতে চেষ্টা করে, তার জীবনের উপভোগের ক্ষেত্রকে করে রাখতে চেষ্টা করে রসসমৃদ্ধ।

এই রূপ ও রুচির অনুশীলনেই সৃষ্ট হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কালের প্রবাহের সংগে মানুষকে আপন জীবন প্রবাহকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। সংস্কৃতি মানুষকে ধারণ করে; এই সংস্কৃতিতেই থাকে মানুষের জীবনের সার্থকতা, তার জীবনভোগের বৈশিষ্ট্য, তার সৃষ্টির কালোত্তরতা। সংস্কৃতি মানুষকে জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে, তাকে জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে আগ্রহশীল করে, চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি রূপের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের সন্ধানে আসে জগৎ ও জীবনের গভীরতা সম্বন্ধে সচেতনতা। আপনার সৃষ্টির মধ্যেও তাই মানুষ এই ইঙ্গিত-প্রবণতাকে সঞ্চারিত করে। এই ইঙ্গিতের মাধ্যমে একের অন্তর থেকে নিঃশব্দে অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত হয় প্রেরণা ও অনুভূতি; অন্তরে অন্তরে গড়ে ওঠে আত্মীয়তা। ধর্মীয় ইঙ্গিতগুলির মধ্যে তাই নিহিত থাকে বহু মানুষের আত্মিক যোগাযোগ ও ঐক্যের প্রকরণ।

এই আত্মিক যোগাযোগ ও ঐক্যের সৃষ্টি হয় মানুষের রচিত শিল্পের মাধ্যমে। অতীতে মন্দির ও মূর্তি যে ঐক্যচেতনা সৃষ্টি করত, আজকের শিল্পী সেই সর্বজন গ্রাহ্য ইঙ্গিত ময়তা সৃষ্টি করতে এখনও সক্ষম হয়নি। যদিও সে প্রচেষ্টার কিছু শেষ নেই। প্রত্যহের ব্যবহারে সামগ্রীতেও সেই ইঙ্গিত-প্রবণতাই ছিল তার পূর্ণতার আধার। এই ইঙ্গিতের বাহন ছিল এইসব দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্য সামগ্রী, পট, পাটা, কাঁথা, মাদুর, সরা, হাঁড়ি, শিকে, বটুয়া। এই ইঙ্গিতের উৎস ছিল জীবনের গভীরে অবস্থিত সংস্কৃতির ভাণ্ডার।

এই সংস্কৃতির ভাণ্ডার আজ শুষ্ক; প্রচলিত রূপের জগৎ এই শিল্পধারাও তাই আজ স্তিমিত ও বিশুষ্কপ্রায়। যে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে রস আহরণ করে মানুষ নিজেকে পরিপুষ্ট রাখত আজ সেদিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ আর মন, গিয়েছে মরে। স্বাভাবিকভাবেই তাই এই শিল্পধারার অবসান সূচিত হয়েছে। সংস্কৃতির ইতিহাস যে ইঙ্গিত বহন করে তাতে জাতির প্রাণশক্তিই প্রকৃত আধার। এই প্রাণশক্তি যদি জাতির থেকে থাকে তবে

পরিবর্ত রূপ জগতের সৃষ্টি করতে তার কোন কষ্ট হবে না; কিন্তু বিশুষ্কমান এই শিল্প ও সংস্কৃতিধারা যদি মূল প্রাণশক্তির ক্ষীয়মানতারই পরিচয় হয় তবে সেই হারিয়ে যাওয়া রূপ জগতের পরিবর্ত সৃষ্টির আশা দুরাশা মাত্র।

লোক সংস্কৃতির স্বরূপ

রূপকথা

পিতৃ পিতামহের স্মৃতি মানুষের নিতান্ত আদরের সম্পদ। কিন্তু কালের ব্যবধানে এই স্মৃতি মলিন হয়ে আসে; তাই তাকে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখার চেষ্টা করে মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এই ইতিহাসের রূপ হয় বিভিন্ন। ইউরোপীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে যে ধারণার উদ্ভব হয়েছে এ দেশের প্রচলিত ইতিহাস সম্বন্ধে চেতনা তা থেকে স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় ধারণায় রাষ্ট্রের উত্থান পতন ও যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীই ছিল ইতিহাসের উপজীব্য। আমাদের দেশে রাষ্ট্রের বিবর্তন বা রাষ্ট্র নায়কদের কার্যকলাপ স্মরণ করে রাখার প্রয়োজন আমরা বোধ করিনি। আমাদের দেশের ইতিহাস-পুরাণের প্রধান উপজীব্য ছিল নীতি ও ধর্মমূলক কাহিনী: মহাভারত আমাদের ইতিহাস-পুরাণের আদর্শ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে সত্য ঘটনার উপাদান ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও ঘটনার সত্যাসত্যই মহাভারতাখ্যানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। বীর্যনিষ্ঠ মানবধর্ম ব্যাখ্যানই মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুরাণকার এই ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধর্মব্যাখ্যার সূত্রে মহাভারতে গ্রথিত হয়েছে নানা আখ্যান ব্যাখ্যানের মালা। ধর্মের আদর্শ সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত হলেও মানুষের মূল প্রকৃতির এবং তার অন্তর্দৃষ্টিকে মহাভারত অস্বীকার করেনি। মানব প্রকৃতির এই রহস্যব্যাকুলতা থেকে কত রহস্যগর্ভ কাহিনী, কত উপন্যাস, কত উপকথা এবং কত কিছু যে এই সব ইতিহাস পুরাণে স্থান পেয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নাই। এই সব আখ্যান ব্যাখ্যান উপকথা রূপকথার যে বিন্যাস মহাভারতের যুগকে অতিক্রম করে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এবং তারও আগে সূত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও বেদেও পরিব্যাপ্ত রয়েছে তা থেকে ভারত-

সমাজের অন্তর মনের রহস্যপ্রিয়তার একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকের সঙ্গে পরিচয় হয় যার তুলনা অন্য কোন মানব সমাজে এত বিস্তৃতভাবে রূপায়িত হতে দেখা যায়নি। একটুখানি লৌকিক ঘটনা, ক্ষুদ্রতম সত্যের আভাসকে অবলম্বন করে ভারতের কাহিনীকার কত বিচিত্র, কত রসসমৃদ্ধ আলেখ্যই না রচনা করেছেন! এই রূপকথা ও উপকথাগুলি মানব-চরিত্রের নানা বিচিত্র রসে সমৃদ্ধ নানা বর্ণসম্ভারে উজ্জ্বল; সত্য বলতে কি এই উপকথাগুলিকে অবহেলা করলে আমাদের সংস্কৃতির একটা মৌলিক দিকের সঙ্গে পরিচয়ই অবহেলিত থেকে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের এই বাংলা কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিল ইতিহাস পুরাণ উপকথা রূপকথার অন্যতম লীলাক্ষেত্র। গ্রামপ্রধানের বা বারোয়ারী তলার চণ্ডীমণ্ডপে এখানে দিনের পর দিন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কাহিনী পাঠ হত, মঙ্গল কাব্যগুলি থেকে পালার গীত হত; আর গৃহে গৃহে পিতামহী মাতামহীদের কোলে শিশু-কিশোরেরা উপকথা রূপকথার কাহিনীর সঙ্গে নিদ্রার স্বপ্নরাজ্য রচনা করত। কিন্তু শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনে ইতিহাস-পুরাণের তথা উপকথা রূপকথার কাহিনীগুলি ক্রমে অবাস্তব-কল্পনার রঙ্গিন কাহিনী মাত্রে পর্য্যবসিত হচ্ছিল; এ বিশ্বাস আর কোন যুক্তিবাদী মানুষের ছিল না যে এইসব কাহিনীর পেছনে কোন প্রচ্ছন্ন সত্যের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। অবশ্য নূতন চিন্তায় বেদ ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে যে বহু বাস্তব ঘটনা প্রচলিত মতের ইতিহাসেরও বহু উপকরণ নিহিত রয়েছে এ বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়মূল হচ্ছে। ইতিহাস-সন্ধানী প্রত্নতাত্ত্বিকের যত্নে ভারতে ইতিহাসের সীমা প্রসারিত হচ্ছে ক্রমে সুদূর অতীতে; বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের গণ্ডীরেখা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ভঙ্গুর। কিন্তু বাংলার উপকথা ও রূপকথাগুলি কিন্তু এখনও অখ্যাতই রয়ে গিয়েছে। একবার বঙ্গ সংস্কৃতির সুপ্তিবিমোচনের প্রধানতম পুরোহিত স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেনের প্রযত্নে বাংলার উপকথা রূপকথার অন্তর্নিহিত সত্য ও ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে কিছু উৎসাহ

জেগে থাকলেও আজ আর তার কিছুমাত্রও অবশিষ্ট দেখা যায় না।

আখ্যান ভাগ ছাড়াও এই রূপকথাগুলি সমাজ জীবনের নানা বর্ণমণ্ডিত ছবিতে উজ্জ্বল; এর কথায় কথায় ছত্রে ছত্রে যে একটা অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ, অত্যন্ত কাছে থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আভাষ পাওয়া যায়, আজকের সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিতান্তই অবাস্তব কল্পনা বিলাসেরই অভিব্যক্তি বলে মনে হয়। যে রূপ-যৌবন সমৃদ্ধ নরনারীর ছবি এই রূপকথাগুলি এঁকে রেখেছে, তাদের কেশ-বেশ ও ভূষণের যে প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য তা কি কোনদিন এ দেশের মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল? জল-জঙ্গলে পূর্ণ বাংলাদেশে কি সত্যই কোনদিন সুদূর অতীতে কোন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল; ছিল কি সেখানে সত্যই গড় আর প্রাচীর ঘেরা শহর যেখানকার রাজপথে দেখা যেত হাতীঘোড়ার, রথ আর চতুর্দ্দোলার সমারোহ! এই সব রাজপথের দুই দিকে কি অলিন্দ গবাক্ষ শোভিত হর্ম্য সত্যই কোনদিন শোভা পেত, ছিল কি আকাশচুম্বী মন্দির বা রাজপ্রাসাদ!

এই রূপকথাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে একটা বিশিষ্ট ধরণের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ছবি স্বভাবতই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই সভ্যতা যথেষ্টই নগর সমৃদ্ধ; একাধিক বেশ বড় বড় শহরের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কল্পনায়ও এই ধরণের সভ্যতার কাহিনী রচনা করা যায় না। এই সব শহর ধনে-জনে যে সমৃদ্ধ ছিল একথা স্বভাবতই অনুমান করা যায়; এই সব শহরের নরনারীর দেহ-সৌন্দর্যের ছবি কি একান্তই কল্পনাভিত্তিক! এরা সূক্ষ্মবস্ত্র পরত; গায়ে থাকত নানা রকমের অলঙ্কার; এরা নানাবিধ বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত ছিল; নৃত্য গীত বাদ্যে এদের যেমন পারদর্শিতা ছিল, যুদ্ধ-বিগ্রহেও এরা ছিল তেমনি পারঙ্গম। আর ছিল এদের বাণিজ্যে পটুতা। স্বভাবতই মনে হয় এদের নদী আর সমুদ্রের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়—; নৌকো ভাসিয়ে এরা বিপদসঙ্কুল সমুদ্র অতিক্রম করে হেলায় দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে যেত। রাজপুত্র কোটাল-

পুত্রের সঙ্গে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল বণিকপুত্র। আর এদের পরস্পরের মধ্যে ছিল পরম হৃদ্যতা। দেশের আর সমাজের এই যে সমৃদ্ধি স্বভাবতই তার মূলে ছিল সমাজের নানা স্তরের মধ্যে এই সমন্বয় আর সামুদ্রিক বাণিজ্যই ছিল এই সমৃদ্ধির মূল। এই সমাজে রাখালে আর রাজপুত্রে বন্ধুত্ব হতে বাধত না। পথে-ঘাটে দেখা হত রাক্ষস খোক্কসদের সঙ্গে; অজগর জঙ্গল আর তেপান্তরের মাঠের সঙ্গে সে সমাজের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ; পক্ষিরাজ ঘোড়া সেখানে রাজপুত্রের বাহন, আর পাটহাতী খুঁজে আনত তাদের শূন্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী; আর সবশেষে মনপবনের বৈঠায় হিজলগাছের নৌকো চালিয়ে সাতসাগর পাড়ি দিয়ে ফিরত আমাদের ছেলের দল।

এ সমাজ কোন সমাজ? সত্যই কি এ সমাজের কোন অস্তিত্ব ছিল? কবে ছিল; এই রূপকথার পরিধির বাইরে তার কোন পরিচয় আছে কি? যদি রূপকথার কাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে না দেওয়া হয় তবে হয়ত একটু অন্বেষণ করলে এর কিছু ভিত্তি পাওয়া খুব অসম্ভব হবে না। এই রূপকথার গল্পগুলির সঙ্গে ভারতে প্রচলিত কথা-সাহিত্য জাতকের ও অবদানের গল্প, মহাভারত ও রামায়ণের আখ্যায়িকা, বিষ্ণুশর্মা রচিত হিতোপদেশ, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা এবং সোমদেবের কথাসরিৎ-সাগরের যথেষ্ট মিল থাকলেও অমিলের মাত্রাও কিছু কম নয়। এই সব কাহিনীতে প্রাচীন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয় থাকলেও বাংলাদেশের ছবি তাতে খুব বেশী নাই। কেবলমাত্র দণ্ডীর দশকুমার চরিতে বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তি নগরী ও সেখানকার সমাজের কিছু উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যায়। এই দশকুমার চরিতে অতীতের সমুদ্রাশ্রয়ী বাঙ্গালী সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা প্রাচীন সাহিত্যে বিরল। কালিদাসের রঘুবংশের বাঙ্গালীরা ছিলেন 'নৌসাধনোদ্যত'। আরও অতীতে গ্রীক ভূগোলজ্ঞ ও নাবিকেরা

গঙ্গার অববাহিকায় বহু নগরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন সাহিত্যে এই নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলবর্তী বাংলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল না। তেমনি পালি সাহিত্যের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ, উপনিষদ বা বেদে এই সাগরোপকূলবর্তী বঙ্গদেশ সম্পর্কে বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এক সময়ে পণ্ডিতমহলেই এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নূতন সৃষ্টি ; সমুদ্র থেকে এ অঞ্চল খুব বেশীদিন মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। এই অল্পদিন কতদিন ; বেদ এবং বেদপরবর্তী সাহিত্যে এই বাংলা সম্বন্ধে উল্লেখহীনতা থেকে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে বেদের যুগে বাংলাদেশে কোন জনবসতি ছিল না। কিন্তু আজ আর সে কথা বলা যায় না। গ্রীক সাহিত্যে এবং বৌধায়নের ধর্ম সূত্রে বাংলাদেশে খৃষ্টপূর্ব যুগে যে জনবসতি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রমাণের প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থনের এতদিনের অভাব আজ নিঃসন্দেহে দূরীভূত হতে চলেছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন আসছে কলিকাতার অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী বহু স্থান থেকে। ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন তাম্রলিপ্তির স্মৃতিবহনকারী আধুনিক তমলুক থেকে প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগের মাটির তৈরী ভাণ্ডের এবং পুতুলের আবিষ্কারে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; ঐ তমলুক থেকেই কিছুদিন আগে কয়েকটি অদ্ভুত গঠনের মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছিল যার সঙ্গে প্রায় চার হাজার বছর আগেকার মিশর দেশের বা ক্রীট দ্বীপের মাটির ভাণ্ডের অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য দেখে পণ্ডিতমহলে কিছু ঔৎসুক্য এবং দ্বিধার সঞ্চার হয়েছিল— বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে কি বৌদ্ধযুগের পূর্বেও জনবসতিপূর্ণ ছিল ? এর পর ২৪ পরগণার বারাসতের কাছে কলিকাতা থেকে মাত্র তেইশ মাইল দূরে বেড়াচাঁপা থেকে (চন্দ্রকেতু গড়) চমকপ্রদ প্রকৃতির প্রাচীন উপকরণ আবিষ্কৃত হতে থাকে। এইসব উপকরণের মধ্যে মাটির তৈরী পাত্র আর পুতুলের কতগুলি নিশ্চিতভাবে খৃষ্ট-জন্মকাল থেকে বহু বছরের প্রাচীন বলে নির্ণিত হয়েছে। এরও পরে

ডায়মণ্ডহারবারের কিছু দক্ষিণে হরিনারায়ণপুর থেকেও কিছু বিস্ময়জনক প্রকৃতির পোড়ামাটির জিনিস পাওয়া গিয়েছে যার সঙ্গে সুপ্রাচীন এলাম ও ক্রীটের আবিষ্কৃত বহু উপকরণের অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহীত এই সমস্ত উপকরণ বাংলাদেশের ইতিহাসকে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কল্পনাতীত ভাবে এক সুদূর অতীতে নিয়ে গিয়েছে। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর খ্যাতনামা নদীগুলির মধ্যে মিশরের নীলনদী, পশ্চিম এশিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস, চীনের ইয়াংসিকিয়াং এবং ভারতের সিন্ধু সুপ্রাচীন সভ্যতার ধাত্রীরূপে গণ্য হয়ে আসছিল। বাংলায় এই প্রাচীন কালের প্রত্নসম্পদের আবিষ্কারে গঙ্গা নদীও এক অতি প্রাচীন সভ্যতার ধাত্রীরূপে গণিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সভ্যতার সঙ্গে হয়ত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল পশ্চিম ভারতের সিন্ধু সভ্যতার, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস অববাহিকার সুমের ও এলামের, ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ক্রীটের এবং নীল নদী তীরবর্তী মিশরের। পূর্বাঞ্চলের ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীন ও জাপানেও হয়ত বাংলার বাণিজ্যতরী পণ্যসম্ভার নিয়ে বিচরণ করত। বাংলার সভ্যতার এই প্রাচীনত্ব এবং বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সেই সুপ্রাচীন যুগের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সম্ভাবনাকে আজ আর অবাস্তব এবং কাল্পনিক বলে অবহেলা করা চলে না।

বাংলার রূপকথার ভিত্তি সন্ধানে যদি আজ কেউ বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা সেই সুদূর অতীতের দিকে তাকায় তবে তাকে ভ্রান্ত বলে মনে করা যাবে কি ? রামায়ণের রাক্ষসকে কেউ আর বিকট আকৃতির অতি মানবীয় কিছু মনে করে না; তেমনি কিষ্কিন্ধ্যার বানরদের এখন টোটেম পূজক সামাজিক মানুষ বলেই গণ্য করা হয়। এদের কথাও কিন্তু ঋগ্বেদে বা বেদ-পরবর্তী সাহিত্যে নাই। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বঙ্গদেশের অধিবাসীদের পক্ষী বলে অভিহিত করা হয়েছে। মনে হয় বাংলার অধিবাসীরা কোন পাখীকে টোটেমরূপে

পূজা করত। পাখীর মধ্যে গরুড়, হাঁস, ময়ুর ইত্যাদিকে সূর্যের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। একথা মনে করা কিছু অন্যায় নয় যে স্মরণাতীত কাল থেকেই বাংলার অধিবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং নানা কল্পনায় সূর্যের উপাসনা করত। বাংলার মেয়েলী ব্রতকথায় রা, রাই, ইতু, মিতু, মণ্ডল ইত্যাদি নানা নামে সূর্যকে অভিহিত করা হয়েছে। এই ব্রতকথাগুলিতেও রূপকথার আদল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নগরভিত্তিক ও বাণিজ্য পুষ্ট সমাজের পরিচয়ে সমৃদ্ধ এই ব্রতকথাগুলিতেও আখ্যায়িকার উপকরণ আছে; রূপকথাগুলি কিন্তু আবেগপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয়ে সমৃদ্ধ। কিন্তু এই রূপকথাগুলির প্রত্যেকটি রূপচিত্র (motif) যেন সজীব হয়ে আজ দেখা দিয়েছে তমলুক হরিনারায়ণপুর এবং সর্বোপরি চন্দ্রকেতু গড় থেকে আবিষ্কৃত। অসংখ্য পোড়ামাটির পদক (Seal), মূর্তি ও ফলকে।

এইসব উপকরণের মধ্যে আছে অসংখ্য নরনারীর মূর্তি ও নানা সমাজচিত্র খচিত ফলক। নরনারীর মূর্তিগুলির অধিকাংশই সুবিন্যস্ত কেশ, নানা অলঙ্কারমণ্ডিত এবং অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত ফলকগুলির গায়ে কত বিচিত্র অট্টালিকা, কত আসবাবপত্র শোভিত কক্ষ, কত পশুপক্ষী, কত নৃত্য ও বাদ্যসমৃদ্ধ দৃশ্য। এর মধ্যে রূপ-কথার পক্ষিরাজ ঘোড়া, গজমোতি হাতী, ব্যঙ্গমাব্যাঙ্গমী পাখী, গৃহকপোত আর শুকসারীর চলেছে মিছিল; মণিমালা, মেঘমালা, কাঁকনবতী রূপবতীরা যেন রূপকথার জগৎ থেকে এই পুতুলগুলিতে মূর্তিমতী হয়ে উঠেছেন। রূপকথার রাজকুমার বীণা বাজাচ্ছেন, অচীনদেশের রাজকন্যা সেই বীণার তালে তালে তুলছেন নৃত্যের লহর। রাজ্যের পাটহাতী কোথাও নির্বাসিত রাজকুমারকে শুঁড়ে তুলে রাজপাটে বসিয়ে আনছে; কোথাও রাক্ষস-খোক্কসেরা নানা বীভৎসরূপে সেজে চলেছে রাত্রির শিকারে।

দক্ষিণ বাংলার সুপ্রাচীন যুগের উপকরণ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি থেকে যে সব মূর্তি এবং দৃশ্যমণ্ডিত ফলক পাওয়া যাচ্ছে মাটিতে তৈরী মূর্ত্তি নির্মাণের কৌশলের দিক থেকে সেগুলির সঙ্গে উত্তর ভারতের অন্যান্য

অঞ্চল থেকে পাওয়া পোড়ামাটির শিল্পবস্তুর খুব বৈষম্য নাই। কিন্তু নির্মিত ফলকে দেহগঠনের ও বস্তুবিন্যাসের যে সূক্ষ্মতা ও লালিত্য বাংলার পোড়ামাটির কাজে দেখা যায় তার মত ঔৎকর্ষ সহজে পোড়ামাটির কাজে অন্যত্র তৈরী দেখা যায় না; ফলকগুলিতে খচিত বিষয়বস্তুর মধ্যেও যথেষ্ট অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য অঞ্চলের পোড়ামাটির কাজে দৃশ্যখচিত ফলকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম; তাছাড়া এই দৃশ্যগুলিকে উত্তর ভারতে প্রচলিত জাতক ও অন্যান্য পরিচিত আখ্যায়িকার সঙ্গে মেলান চলে। কিন্তু বাংলাদেশের দৃশ্যসম্বলিত ফলকের সংখ্যা অগুন্তি; আবার অধিকাংশ ফলকেই দেখা যায় অভিনবত্ব; আর অনুরূপ পরিচিত আখ্যানবস্তুর সঙ্গে এগুলির মিলও কম। অন্যদিকে এইসব মূর্তি ও ফলকে এক সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এই নগরসমাজের নরনারী দেহ-সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য ও আর্থিক সচ্ছলতায় সমৃদ্ধ; জীবনকে উপভোগ করবার নানা উপকরণ বিলাস ও ব্যসনের কোন অভাব তাদের নাই; দুঃখ-দারিদ্র্য বা বিপদের কোন আভাস এই সমাজকে আচ্ছন্ন করে না। দূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পরিচয়ও এইসব শিল্পদ্রব্যে বেশ কিছু পাওয়া যায়। আর দৃশ্য ফলকগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে বাংলার রূপকথা উপকথা ব্রতকথার পরিচিত আবেগপূর্ণ সুরটি যেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে। মনে হয় এইসব দৃশ্য ফলকে বাংলার পরিচিত সুয়ো-দুয়োর গল্প, শীত-বসন্তের আখ্যায়িকা, ডালিমকুমারের কাহিনীর বীজ নিহিত রয়েছে। নিম্ন বঙ্গের এই নূতন আবিষ্কারের পর রূপকথার আর ব্রতকথার অনির্বচনীয় সুখ সৌভাগ্য সমৃদ্ধ সভ্যতার অস্তিত্বের কথা আর সম্পূর্ণভাবে অলীক বা অবাস্তব বলে অভিহিত করা যায় না। আজ থেকে দুই বা তিন হাজার বছর আগে গঙ্গার অববাহিকায় এক বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল; এই অঞ্চল ছিল বহু সংখ্যক নগর ও বন্দরে শোভিত; এখানকার উদ্যোগী ও লক্ষ্মীমন্ত মানুষ সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গকে অতিক্রম করে

সুদূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত ; আর সেই দেশ থেকে আসত নানা দ্রব্য সম্ভার। সভ্যতার ও সংস্কৃতির দিকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে নৈকট্য থাকলেও যোগাযোগ ছিল কম। সমগ্র জাতক কাহিনীতে ভারতের বহু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় থাকিলেও নিম্নবঙ্গ সম্বন্ধে কোন উল্লেখই এই জাতক বা অবদান কাহিনীগুলিতে নাই ; কিন্তু এগুলি রচনা হওয়ার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই যে নিম্নবঙ্গে এক সুপ্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্যই মনে হয় সংস্কৃত এবং পালি ইত্যাদি ভারতের প্রচলিত সাহিত্য বাংলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে মৌন হলেও এই প্রচলিত রূপকথাগুলির মধ্যে সেই সুপ্রাচীন যুগের রূপযৌবন ও সচ্ছলতা সমৃদ্ধ বাংলার ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়ে আছে। নিম্নবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আজ এই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি আত্মপ্রকাশ করছে ; আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রাচীরঘেরা বিস্তীর্ণ নগরীর ধ্বংসাবশেষ ; থরে থরে নানা উপকরণ আবিষ্কৃত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে সম্পদ ও সমৃদ্ধির। যাদের প্রযত্নে আজ বাংলার এই প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য জনসমাজে প্রচার লাভ করেছে তারা সত্যই ধন্যবাদার্হ। যা জানা গিয়েছে অনুমান হয় তা বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ আবিষ্কারের পূর্বাভাষ মাত্র। হয়ত একদিন এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় নীল বা সিন্ধুনদের বা ইউফ্রেটিস টাইগ্রীস বিধৌত অঞ্চলের মতই এক প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার আবিষ্কার হয়ে বিশ্বজগৎকে বিস্ময়াবিষ্ট করবে। তখনই প্রমাণ হবে বাংলার রূপকথার কাহিনীগুলি রামায়ণ মহাভারত বা জাতক কাহিনীগুলির মতই ইতিহাস-ভিত্তিক সমাজ-লেখ্য অলীক বা অবাস্তব গল্পকথা নয়।

বাংলার কবি কাশীরাম দাস ভাষায় (অর্থাৎ বাংলা ভাষায়) মহাভারত কাহিনী রচনা করে বৃহৎ ভারতখণ্ডের সঙ্গে বাংলার যোগ-বন্ধন সম্পূর্ণ করেন। বাংলা যে ভারতবর্ষেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একথা উপলব্ধি করতে বাঙ্গালীর পক্ষে যে বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিমালয় মুকুটিত ভারতভূমি সম্পর্কে চেতনার আভাষ সর্বপ্রথমে পাওয়া যায় ঋগ্বেদে; বেদগুলির পর আরণ্যক, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদগুলি সংকলিত হয়। তারও পরে রচিত হয় সূত্র সাহিত্য, প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এবং মহাভারত ও রামায়ণ। মহাভারতে সামগ্রিক ভারতভূমির ভৌগোলিক এবং সংস্কৃতিগত ঐক্য সম্বন্ধে চেতনা পূর্ণতা লাভ করে থাকলেও দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা রামায়ণের বৈশিষ্ট্য।

সময়ের স্রোতের সঙ্গে অখণ্ড ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণার উন্মেষ ও বিকাশের মধ্যে ভারত সংস্কৃতির ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে। এই সাযুজ্য ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর বিবর্তনের মধ্যে বাংলার স্থানটি এখনও খুব ভাল করে নির্ণিত হয়নি। বাংলা সম্পর্কে অনুরাগী ইতিহাসের ছাত্র শোনে যে ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু অঞ্চলের তুলনায় নরম পলিমাটিতে গড়া বাংলার সমতলভূমি অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের সৃষ্টি; সুদূর সিন্ধু সরস্বতীর তীরে যখন ঋগ্বেদের গাথাগুলি সংকলিত হচ্ছিল তখন জল ও জঙ্গলে আকীর্ণ বাংলায় হয়ত লোকবসতিই ছিল না। এ কথা সত্য কি মিথ্যা তা আজ জোর করে বলা না গেলেও কিছু দিন হল বাংলা দেশের এখানে ওখানে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে আজ থেকে তিন চার বা পাঁচ হাজার বছর আগেও গঙ্গার দক্ষিণ অববাহিকায় যে উচ্চস্তরের সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল এ অনুমান দৃঢ় হচ্ছে। অন্তত খ্রীষ্ট জন্মের তিন

চার শ' বছর আগে বাংলার কোথাও কোথাও যে নগর বন্দর অধ্যুষিত জনবসতি ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলার এই জনবসতি বা সভ্যতা সম্বন্ধে সুপ্রাচীন ঋগ্বেদ থেকে প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য প্রায় সম্পূর্ণ নির্বাক। যাও বা কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় তা তাচ্ছিল্য বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরই নামান্তর।

মহাভারতই ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ যাতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে কিছু বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে প্রাচ্য অঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠার বিবরণটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। অতীতে দৈত্য বা অসুর বংশে বলি নামে এক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল পাঁচ ছেলে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। বলি তার বিশাল রাজ্য এই পাঁচ ছেলেকে ভাগ করে দেন। বলির এই পুত্রদের নামানুসারেই—বর্তমান বিহার উড়িষ্যা এবং বাংলার অন্তর্গত পাঁচটি রাজ্য গঠিত হয়। মহাভারতের সাহিত্যে প্রসঙ্গক্রমে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র এবং সুহ্মের নাম প্রায়ই উল্লিখিত হয়েছে দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে কুরু নায়ক দুর্যোধনের আনুকূল্যে অধিরথ সূত কর্ণ অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থেই পৌণ্ড্র রাজ্যের অধিপতি বাসুদেবের সঙ্গে যদুবংশীয় বাসুদেব কৃষ্ণের বিরোধ ও পৌণ্ড্র বাসুদেবের নিধনের কাহিনীতে পুণ্ড্রদেশের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভারত যুদ্ধে বঙ্গ কলিঙ্গের অধিপতিরা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন একথাও সুবিদিত। মহাভারত কাহিনীর ঘটনাগুলির মূলে কোন সত্য থাকলে এগুলি যে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সহস্র বৎসর বা তারও আগে ঘটেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে বাংলা অঞ্চলে সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় না। তবে সামান্য কিছু মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরো বা কয়েকটি ছোটখাট মুদ্রিত চাকতি (Seal) ছাড়া এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে আজও আমরা কিছু জানতে পারিনি।

বলিরাজা ছিলেন অসুর; ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই অসুরেরা এক বিশেষ সমস্যা। আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদেই অসুর পদের ব্যবহার পাওয়া যায়। তবে ঋগ্বেদে 'অসুর' পরবর্তী যুগের 'অসুরের' মত দেববিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ঋগ্বেদে বরুণ দেবতাকে অসুর শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করা হয়েছে দেখা যায়। ঋগ্বেদের দেবতা বরুণ—আদিত্যদের অন্যতম। অন্যান্য আদিত্য এবং দেবতাদেরও প্রসঙ্গক্রমে ঋগ্বেদে অসুর বলা হয়েছে। কিন্তু ক্রমে এই অসুর পদ অদৈব বা দেববিরোধী এই অর্থেই প্রচলিত হতে থাকে। বলি এই দেববিরোধী অর্থেই অসুর। দেবতা বলতে গোড়াতে ইন্দ্র, অগ্নি, বসু, রুদ্র প্রমুখ তেত্রিশ সংখ্যক দেবতাকেই বোঝাত। ক্রমে পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রধান দেবতারূপে আখ্যালাভ করেন। ব্রহ্মার কথা ঋগ্বেদে না থাকলেও ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণস্পতিই ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত সাহিত্যে ব্রহ্মা আখ্যায় খ্যাতিলাভ করেন। শিব ঋগ্বেদের রুদ্র নামীয় দেবতার সঙ্গে সমার্থক। কিন্তু বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা যায় ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত দেবতা আদিত্য বিষ্ণুর। ইনিই পরে নারায়ণ এবং যদুবংশীয় বীর বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে বহু ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং ভারতজন মনের পরমতম উপাস্যে পরিণত হন। পুরাণের বিরুদ্ধে বিষ্ণুকে দেবতাদের স্বার্থরক্ষায় যত্নপরায়ণরূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকলেও বলি ইত্যাদি অসুরেরাও যে বিষ্ণুর নিতান্ত কৃপাভাজন ছিলেন এ বিষয়ে কোন দ্বিধা দেখা যায় না। তবে অসুরেরা ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না; একটু বিচার করলেই বুঝতে পারা যায় অসুরদের সঙ্গে প্রকৃত বিবাদ ইন্দ্রের। এই বৈষম্যকে আমি ইন্দ্রানুসরণকারী সংস্কৃতির সঙ্গে মূলত ইন্দ্রের প্রতি আনুগত্যহীন সমাজের বিরোধ বলেই অনুমান করি। কোন কারণে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের যে স্তরে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রকে প্রাধান্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা

হয়েছিল সমাজের অভ্যন্তরের সঙ্গে তাদের ক্রমে বৈরিতা দেখা দেয়। অসুরদের সংস্কৃতি, উপাস্য, প্রথা-রীতি ইন্দ্রানুরাগী সমাজের সংস্কৃতি, উপাস্য এবং প্রথা-রীতি থেকে খুব স্বতন্ত্র ছিল না; আর এই দুই সমাজের মানুষ যে নিকট সন্নিধানেই বসবাস করত এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

ঋগ্বেদ মূলত ইন্দ্রানুসরণকারী সমাজেরই সংকলন। ঋগ্বেদের ঋষিরা প্রধানত ইন্দ্রাশ্রয়ী এবং ইন্দ্রানুগৃহীত রাজা সুদাসের প্রাধান্যলাভ ঋগ্বেদে উল্লিখিত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাজা সুদাসের পরিচয় তিনি ভরত বংশের ত্রিৎসু শাখার সন্তান। এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঋগ্বেদ সংকলনে এই ভরতবংশেরই প্রাধান্য; ঋগ্বেদ যেন ভরতবংশেরই কীর্তিগাথা। যুদ্ধে সুদাস পাঞ্জাব অঞ্চলের যদু অনু, তুর্বসু ইত্যাদি অন্যান্য রাজন্যদের পরাজিত করে সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিলেন। ভরতবংশের এই বিস্তৃতির মধ্যে ভারত ভূমির ভৌগলিক সংজ্ঞা বিদ্ধৃত আছে। মহাভারতে ভরত বা কুরুবংশ গঙ্গানদীর তীরে (মীরাটের সন্নিকটবর্তী) হস্তিনাপুরে অধিষ্ঠিত। তাদের সার্বভৌমত্ব সমগ্র জম্বুদ্বীপে বিস্তৃত; ভরতবংশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বলেই ভারতবর্ষ। ভরতরা যজ্ঞপন্থী ও ইন্দ্রোপাসক; ভারতবর্ষ গ্রন্থবিশেষে ইন্দ্রদ্বীপ নামেও পরিচিত; স্বয়ং ইন্দ্রকে বৈদিকসাহিত্যে কৌশিকবংশীয় অর্থাৎ ভরতবংশীয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। কুরুদের রাজ্যাভিষেককে বলা হত ঐন্দ্রাভিষেক। অর্থাৎ কুরুরাজ নিজেই ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত হতেন। এই ইন্দ্রানুরাগী সমাজের নিকট অসুর বলির বংশজাত অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেরা যে অবহেলিত বা অবজ্ঞাতই থাকবে এ বিষয়ে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না।

কিন্তু মহাভারতেই ইন্দ্রানুরাগী সমাজের বিবর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাভারত রচনার গোড়ার দিকের কাহিনী মূলত কুরুবংশের সঙ্গে পাঞ্চালদের দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত; ক্রমে এই দ্বন্দ্বে

কুরুদের অন্যতম শাখা পাণ্ডবরা পাঞ্চালদের সাহচর্য লাভ করে। এই সাহচর্যের সূত্রপাত হয় পাঞ্চালরাজ দুহিতার সঙ্গে পাণ্ডবদের বৈবাহিক সম্বন্ধের সঙ্গে। এই বিবাহ বাসরে মহাভারত কাহিনীর মূল কর্ণধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম উপস্থিতি-ঘটনার বিবর্তন তথা সংস্কৃতির বিবর্তন পথের অন্যতম প্রধান ঘটনা। বাসুদেব কৃষ্ণ যদুবংশের সন্তান। এই যদুরা ঋগ্বেদের যুগে সুদাসের বিরুদ্ধাচরণ করে খ্যাতি অর্জন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রানুরাগী সংস্কৃতিতে খুব আস্থাশীল ছিলেন বলে মনে হয় না; বরং ভাগবত পুরানে তাঁকে প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্রবিরোধী রূপেই (গোবর্দ্ধনধারণ কাহিনী স্মরণ করুন) চিত্রিত করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণকে সর্বাত্মক ব্রহ্মের স্বরূপ হিসাবে সূর্যের অনুরাগী রূপে দেখা যায়। মহাভারত কাহিনীতেই কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মরূপে কীর্তিত হয়েছেন; গীতায় তিনি নিজেকে আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণুরূপে প্রচার করেন; এইখানেই কৃষ্ণ বিষ্ণুর অভিন্নতার প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম কৃষ্ণ বাসুদেবকে আশ্রয় করেই সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। ভারত যুদ্ধোত্তর কৌরবেরা (পাণ্ডবেরা!) সম্ভবত বাসুদেব কৃষ্ণকেই কুলদেবতা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কূট-কৌশলে বহু বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ ঐক্য লাভ করেছিল; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে সারাভারতে অবিসংবাদি সার্বভৌমত্ব—কুরুদের (পাণ্ডবদের) হাতেই বর্তে ছিল; শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় গোঁড়া ইন্দ্রানুরাগ পরিত্যাগ করে কুরু-ভরতেরা হয়ত ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে বাসুদেব কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর অনুগত হয়ে পড়েন। এর ফলেই ভারতখণ্ডে এক অভাবনীয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। ইন্দ্রবিরোধী সমাজের পক্ষে আর ভরতবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন থাকেনি; সারা দেশেই ইন্দ্রবিরোধী ও ইন্দ্রানুরাগী সমাজের মধ্যে একটা সহনশীলতা এবং আপোষের মনোভাবের সৃষ্টি হয়; এবং উভয় শ্রেণীতেই নূতনভাবে দৈবী-কল্পনাগুলিকে পুনর্বিন্যাস করে নেওয়ার

প্রয়াস দেখা দেয়। এই নূতন ভাবধারায় কৃষ্ণ-বাসুদেবই হলেন প্রধান উপাস্য। এই আদর্শকে অবলম্বন করে পুরাণগুলি রচিত হয় এবং মহাভারতকে নূতন করে বিন্যস্ত করা হয়। ভারতবর্ষ প্রকৃত মহাভারতে পরিণত হয়।

এই ভাবে সহনশীলতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে যে বিরূপ মনোভাব ছিল তার পরিবর্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তন কিন্তু একদিনে হয়নি; বৌদ্ধ এবং জৈন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে নূতন ধর্মসঙ্ঘগুলি মাথা তোলায় এই বিবর্তনের পথে নানা বৈচিত্র্য ঘটেছিল। তবে সাধারণ পর্যায়ে দেখা যায় যে বাংলাদেশে পুরাণধর্মের প্রচলন হতে আরম্ভ করল। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পুরাণবিহিত দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হতে লাগল; বাংলা বৃহৎ ভারতখণ্ডের অন্যতম অংশীদার রূপে গৃহীত হল। হয়ত ঐ সঙ্গেই বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ও বাংলায় তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেছিল; পুরাণ বিহিত সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতিরও বেশ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হল। বাংলার সঙ্গে মূল ভারতভূমির যোগাযোগ যখন এই ভাবে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল তখন মগধের গুপ্ত রাজবংশের অবসানে বাংলা ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব, শশাঙ্ক, জয়নাগ ইত্যাদি রাজন্যদের আনুকূল্যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। পরে পাল রাজন্যবর্গ বাংলার রাজপতাকা সুদূর কান্যকুব্জ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পালরাজগণ আনুগত্যে বৌদ্ধ হলেও তাঁদেরই আমলে বাংলায় কৃষ্ণবাসুদেব আশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের যে বহুল প্রচলন হয়, দেশব্যাপী নির্মিত অসংখ্য বাসুদেব মূর্তিই তার প্রমাণ। পুরাণগুলি কৃষ্ণবাসুদেব আশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের অনুপ্রেরণার আধার হলেও মহাভারতই এই সাধন তথা সংস্কৃতির ধারার মূল উৎস। পুরাণগুলিকে এই প্রসঙ্গে মহাভারতেরই পরিপূরক বলে গণ্য করা যেতে পারে; বস্তুত বিষ্ণুপুরাণে বাসুদেব অপেক্ষা ভগবান বিষ্ণুর ক্রিয়াকলাপেরই

পরিচয় বেশী; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। বাসুদেবের লোকোত্তর কর্মজীবনের কাহিনী, তাঁর শৌর্য-বীর্য, বুদ্ধি-মেধা, কর্মকৌশল, মহত্ব ও দেবত্বের প্রকৃত রূপটি একমাত্র মহাভারতেই সুস্পষ্টভাবে আখ্যাত হয়েছে। মহাভারতেই মানুষের রূপ ও নির্মোককে কেটে শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎসত্বায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বাংলা তথা ভারতের যে বহু সহস্র বিষ্ণু মূর্তি দেখা যায় তার প্রায় শতকরা আশীটির ওপরে মুর্তি বাসুদেব মূর্তি; এই বাসুদেব কৃষ্ণকে অবলম্বন করেই মহাভারত সত্বা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছিল। পুরাণ ও ভাগবতের বিষ্ণু ও গোপবালক কৃষ্ণের অনুধ্যান বাংলাদেশ করে থাকলেও প্রকৃত ভারত সাযুজ্য লাভে বাংলা মহাভারতের মুখ্যযন্ত্রী বাসুদেবকেই অবলম্বন করেছিল।

খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে পাথরে বাসুদেব মূর্তি তৈরি হয়েছিল। পুরাণসম্মত ধ্যান অনুসারে এই মূর্তি গঠিত; হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; গলায় প্রলম্বিত বনমালা। কিন্তু দেহগঠনে কুশান শিল্পধারার তীক্ষ্ণরেখাবহুল কাঠিন্য। এই কাঠিন্য ক্রমে বাংলার স্পর্শাতুর মোহময় কমনীয়তার সমৃদ্ধ হয়ে লীলারহস্যমণ্ডিত এক অপূর্ব সুষমায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল; রাজমহল পাহাড়ের চিক্কণ কাল কষ্টিপাথর এই মূর্তির উপকরণ; বাংলার রসকোমল মৃত্তিকার সন্তানের হাতে এই কঠিন পাথর অপূর্ব করুণায় স্নিগ্ধ রসমণ্ডিত হয়ে বাংলার মর্মরহস্যকে রূপায়িত করে তুলেছিল। ভাবরসসমৃদ্ধ এই অপূর্ব সৃষ্টি যে মনন কল্পনা থেকে পুষ্টিলাভ করেছিল সেই মহাভারত কাহিনীর অনেক সংস্কৃত পুঁথি বাংলার বহু প্রাচীন টোল, চতুষ্পাঠি আর পণ্ডিতের বাড়ী থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব পুঁথি খুব পুরোনো না হলেও বাংলায় মহাভারতের পঠন-পাঠন যে বিশেষ বিস্তার লাভ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।• কিন্তু সংস্কৃত মহাভারত চিরকালই বিদগ্ধজনের গণ্ডীর জিনিস, পণ্ডিতের সম্পত্তি। কথকের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ছাড়া জনগণের নিকট এই সংস্কৃত পুঁথির আখ্যানভাগ উপস্থিত হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা

ছিল না। কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষের মনেও মহাভারত সংস্কৃতির প্রভাব যে গভীরভাবেই অনুপ্রবেশ করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সংস্কৃতির সম্প্রসারণের ফলেই কাশীরাম দাস তাঁর অমৃতময় লেখনী মুখে মহাভারত কাহিনীকে বাংলার প্রাকৃতজনের গৃহপ্রাঙ্গনে এনে উপস্থিত করেছিলেন।

কাশীরামদাসের মহাভারত বাংলা ভাষার পরমতম সম্পদ; সংস্কৃত মহাভারত যেমন কাব্যরীতির বিস্ময়কর সৃষ্টি—বাংলা মহাভারতও তেমনি বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত অপরিমিত শক্তির প্রমাণস্বরূপ। ভারতকাব্য সত্যাশ্রয়ী মানব আদর্শের অতুলনীয় প্রকাশে সমৃদ্ধ। সমাজের জটিল বিধিবন্ধন ও ধর্মের কঠিন নির্দেশকে অতিক্রম করে মহাভারত দৃঢ় ও পুরুষ সত্যভাষণে কখনও দুর্বলতা বোধ করেনি। মহাভারত কাহিনীর এই ঋজুতা, দার্ঢ্য এবং অনলঙ্কৃত পৌরুষ ভারতের সত্বাকে এক অভাবনীয় ভাস্বরতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যুগ যুগ ধরে এই ভারতকথা তাই মানবসত্যের অন্যতম প্রধান অভিব্যক্তিরূপে অনুশীলিত হবে। এই বজ্রদৃঢ় কাহিনীকে বহন করবার ক্ষমতা সাধারণ ভাষার পক্ষে আয়ত্ব করা সহজ নয়; অমিতসম্ভাবনাপূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত রহস্যঘন দৃঢ়তা সম্পাদনে ব্রতী হয়ে কাশীরাম দাস এক অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আশ্চর্য এই যে এই কার্যে কাশীদাস যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ভারতের অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় তার সমকক্ষতা লক্ষ করা যায় না।

সুদূর অতীতে খ্রীষ্টিয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে বাংলাদেশে বাসুদেবের মূর্তি প্রথম নির্মিত হয়েছিল এবং এই প্রমাণ থেকে মনে হয় বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম তথা বাসুদেবের উপাসনাও প্রবর্তিত হয়েছিল। এই বাসুদেব উপাসনার পেছনে মহাভারত গ্রন্থের অনুশীলনও অনুমান করা যেতে পারে। ক্রমে এই বাসুদেব উপাসনা অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। গুপ্তযুগের কোন বাসুদেব মূর্তি বাংলায় বড একটা পাওয়া না গেলেও পাল এবং সেনরাজাদের রাজত্ব

কালে বাংলায় যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভূত বিস্তার হয়েছিল সে সম্বন্ধে সাহিত্য বা প্রাচীন লিপি বা লেখা থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এই যুগের অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তিগুলি দেখলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এইসব মূর্তি স্বভাবতই অসংখ্য মন্দিরের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। মন্দির নির্মাণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে পাথরের যোগান না থাকায় বাংলাদেশের মন্দির-শিল্পে পোড়ান ইটেরই বেশী ব্যবহার হয়েছে। ইটের মন্দিরের গায়ে নানা কারুকার্য খচিত করবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাক্‌মুসলিম আমলের মন্দির বাংলাদেশে বিশেষ পাওয়া যায়নি ; হুগলীর সন্নিকটবর্তী ত্রিবেণীতে একটি মুসলমান দরগা আছে (জাফর খাঁ গাজীর দরগা)। এই দরগার প্রাচীরবিন্যাসে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে নষ্ট করে দেওয়া পাথরে খোদাই করা সুন্দর সুন্দর মূর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও লক্ষ্য করা যায়। এইসব মূর্তির সাহায্যে যেসব দৃশ্য রচিত হয়েছিল কোন কোন জায়গায় খ্রীষ্টিয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর লিপিতে সেগুলিকে কৃষ্ণজীবনের নানা লীলার দৃশ্য বলে চিনতে পারা যায়। পাল সম্রাট ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের (প্রাচীন সোমপুর বিহার) মন্দিরেও কৃষ্ণ-লীলার নানা মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে মুসলমান রাজাদের আমলে নির্মিত অসংখ্য বাংলা রীতির মন্দিরের প্রাচীরে কৃষ্ণলীলার ফলকের ব্যাপক ব্যবহার দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। আখ্যানমূলক শিল্পের ভিতর কৃষ্ণজীবনের এই জনপ্রিয়তাও বাংলা দেশে কৃষ্ণপ্রীতির পরিচায়ক। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই আখ্যানমূলক শিল্পের কৃষ্ণকাহিনীর প্রধান উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন ; জন্মকাল থেকে মথুরায় আগমন পর্যন্ত কৃষ্ণের জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনাই এই সব শিল্পাখ্যায়ি-কায় দেখতে পাওয়া যায় ; কিন্তু মহাভারত কাহিনীর বাসুদেব সংক্রান্ত কোন ঘটনার আলেখ্য এই সব চিত্রে নেই। এদিকে বিগ্রহ মূর্তির ক্ষেত্রে তাঁর আকৃতি চতুর্ভূজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী ; এখানে

তিনি বাসুদেব বিষ্ণু। শিশু ও কিশোর কৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করে দেশব্যাপী বাৎসল্যরসের বন্যাপ্রবাহিত হয়ে থাকলেও মানবাদর্শের পরম অভিব্যক্তি রূপে কৃষ্ণবাসুদেবের পরিণত জীবনই ভারতের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছে; এই কৃষ্ণই ভারতকল্পনার নররূপী ভগবান (কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং)।

কাশীরামদাস ভারত সংস্কৃতির এই অভাবনীয় সৃষ্টিকে বাংলা-ভাষার মাধ্যমে সাধারণ সংস্কৃতভাষা অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী প্রাকৃতজনের অধিগম্য করে আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী করে রেখে গিয়েছেন। মহাভারত যদি হিমালয়মুকুটিত এবং জলধিবিধৌত পদ ভারতভূমির সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উপকরণ হয়ে থাকে তবে কাশীদাসেরই মহাভারত সাধারণ বাঙ্গালীকে এই ঐক্য সম্বন্ধে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতের ধর্মগত তথা সাংস্কৃতিক একতাবোধ জাগ্রত করতে আর কিছুকেই মহাভারতের সমকক্ষ বলে গণ্য করা যায় না। এই মহাভারতের বলিষ্ঠ আদর্শবোধকে গ্রহণ করতে বাংলা দ্বিধা করে নাই; এই মহাভারতের দেবতাকে গ্রহণ করেই বোধ হয় বাংলা আপনাকে বৃহত্তর ভারতের অন্যতম অংশীদার বলে গণ্য করতে শিখেছিল; এই অংশীদারত্বের বোধকে গভীর এবং ব্যাপক করার ক্ষেত্রে কাশীরাম দাসের কৃতিত্ব তুলনাহীন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর জীবনের আখ্যানমূলক চিত্র বা বাসুদেব কৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্তিকে অবলম্বন করে যে অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল, অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তিতে, পাহাড়পুর ত্রিবেণী বা বাংলার মন্দিরগুলির অলঙ্করণে যার পরিচয় পাওয়া যায় কাশীরামদাসের মহাভারত সেই আদর্শ সাধনারই পরিপূর্ণ রূপ। কাশীরাম দাস বাঙ্গালীকে সত্যই অমৃত পরিবেশন করে গিয়েছেন; যুগের পর যুগ বাঙ্গালী এই অমৃত আকণ্ঠ পান করে ধন্য হবে।

কাঁথা—ফরিদপুর

মনসাঘট—বরিশাল

পট ও লোক চিত্র

বছর পনোর কুড়ি আগেও শরৎকালে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এক শ্রেণীর লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, যাদের পেশা ছিল ছবি দেখানো। যে কোন রকম ছবিকেই সাধারণ ভাবে বলা হ'ত পট ; কিন্তু এই ছবিগুলি ছিল একটু বিশেষ ধরণের। এগুলি চওড়ায় হত দেড় হাত পৌণে দু'হাত আর লম্বায় আট দশ হাত বা তারও বেশী ; আর অধিকাংশ পটেরই শেষদিকে নরকপুরীতে যমরাজের সভা আর পাপী লোকদের শাস্তিবিধানের নানারকম ছবি থাকতো। এইজন্য ছবিগুলিকে বল্‌তো যমপট বা যাদুপট ; আর যারা পট দেখাতো তাদের বলা হ'ত যাদুপটুয়া !

পূর্বে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এই পটুয়া বা পোটোদের দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চল ছাড়া এখন আর তাদের বংশধরদের খুঁজে পাওয়া যায় না। সহকর্মী অন্যান্য জাতের অনেক কারুশিল্পীদের মত এরাও জাতিগত পেশা ছেড়ে বেকার হয়ে পড়েছে। যারা পেরেছে দু'একঘর এদেরই মধ্যে হালবলদ নিয়ে জমির ভার বাড়াচ্ছে। অন্যেরা উচ্ছন্নে যাবার মুখে। অনেক পরিবার হয়তো নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে। বীরভূম জেলার কয়েক ঘর পটুয়া কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও নূতন ছবি এঁকেছে। তাদের কাছে পটশিল্পের ধারাটা এখনও অপরিচয়ের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়নি একেবারে। বাঁকুড়া আর মেদিনীপুরে তাদের সহব্যবসায়ীদের পট আঁকবার স্মৃতি আর বড় একটা নেই। যদিও খোঁজ করলে পট দু'একখানা এর ওর মাচার ওপর বা চালার বাতা থেকে আজও বা'র করা অসম্ভব নয়। বীরভূমের পোটোরা সবাই ধর্মে মুসলমান। যদিও নামগুলি এদের এখনও হিন্দুদেরই মত। এদের মধ্যে

জাতিগত সংস্কারের এক অদ্ভুত কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। পোটোরা নিজেদের বিশ্বকর্মার সন্তান বলে দাবী করে, ভারতবর্ষীয় সমাজের আর দশটা শিল্পজীবী শ্রেণীর মতই; তবে সমাজে অন্ত্যজ হয়ে যাওয়া সম্বন্ধেও এদের মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে। এদের কোন এক পূর্বপুরুষ এক সময়ে হরপার্বতীর ছবি আঁকছিল। এমন সময় হঠাৎ সেখানে মহাদেবের আবির্ভাব হয়। শিল্পসৃষ্টির বিষয়বস্তু হিসেবে শিবপার্বতীর মিলন পরিকল্পনা শিল্পীর পক্ষে যথেষ্ট আকর্ষনীয় হলেও মহাদেব চিরকালই তাঁর ভক্তসমাজে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের উদ্রেক করে এসেছেন। শিল্পীগুরু ত' মহাদেবের উপস্থিতিতে এমনি ভয় পেয়ে গেলেন যে হাতের তুলিটা মুখে পুড়ে দিলেন। এতে ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ কি থাকতে পারে সাধারণ বুদ্ধিতে তা বুঝ্‌তে পারা না গেলেও মহাদেবের রোষের উদ্রেক হ'ল; অন্য কোন অপরাধ হাতের কাছে না পেয়ে তুলিটা এঁটো ক'রে ফেলবার দোষে শিল্পীকে জাতে নীচু করে দিলেন। পোটোরা বলে, সেই থেকে সমাজে তারা নীচু হয়ে আছে।

শিল্পীকে তার শিল্পদ্রব্য সৃষ্টির জন্য নানা রকমের উপকরণ ব্যবহার কর্‌তে হয়, নানা ধরণের হাতিয়ার-পত্রের দরকার হয় তার শিল্প গ'ড়ে তুলতে। যে জিনিষ নিয়ে শিল্পীর কাজ, যে সব উপকরণ তার ব্যবহারে লাগে, যে সব পদার্থে তৈরী হয় তা'র হাতিয়ার-পাতি সেইসব দ্রব্যের জাত বিচারে অনেক সময় শিল্পীর সামাজিক মর্য্যাদার ইতরবিশেষ হয়ে থাকে। চর্মপাদুকা ব্যবহার করা দোষের না হলেও চর্মকারের স্থান শিল্পীসমাজে মোটেই শ্লাঘনীয় নয়। এর পেছনে যুক্তি যাই থাকুক না কেন, যে উপকরণে শিল্পীকে কাজ কর্‌তে হয় সে জিনিষ ঘৃণিত ব'লে বিবেচিত হওয়ায়ই চর্মকার সমাজে অন্ত্যজ থেকে গেছে। তাঁতীদের যে শ্রেণী উচ্ছিষ্ট হয় এমন মণ্ডে বস্ত্র মার্জনা করে অন্যান্য তাঁতীরা তাদের নিজেদের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত ব'লে স্বীকার করে না, মনে করে নীচু। কারুশিল্পীদের মধ্যে উঁচু নীচু বিচার বোধ হয় উপকরণের শুচিতা

থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এবং মনে হয় পোটোরা কোন ঘৃণ্য উপকরণ ব্যবহার করেই সমাজে পতিত বলে গণ্য হয়েছিল। সমাজের এই আস্পর্দ্ধার ফলেই হয়তো কোন সময় তারা মুসলমান-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, যদিও গুণ ও কর্মগত সংস্কারের দিক্ থেকে তাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মুসলমানধর্ম অবলম্বন করলেও পটুয়ারা নবগৃহীত ধর্মে নিষিদ্ধ জাতিগত উপজীবিকা ত্যাগ করে নাই। নূতন সংস্কৃতির আশ্রয়ে এসেও তারা শুধু যে ছবি আঁকার পেশাই বজায় রাখ'ল তা নয়। এই নূতন পরিবেশেও ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনের কোন পরিবর্ত্তন করলো না। ভারতের পরিচিত আখ্যায়িকাগুলি তাদের ছবির উপজীব্যরূপে চল্‌তে থাকলো। পটুয়াদের ছবিতে যে সব কাহিনী বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জীবনলীলাই তারমধ্যে প্রধান। একথা বললে কিছু অত্যুক্তি হবে না যে এই দুই মহাপুরুষের দুই লোকোত্তর চরিত্র ও জীবন কথা যুগে যুগে ভারতবর্ষীয় সমাজকে যেভাবে অনুপ্রাণিত ক'রেছে তার হুবহু তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলার মধ্যে তাঁর অলৌকিক জন্মকথা, তাঁর গোচারণ ও অসুর-দলন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা পটগুলিতে বেশী পাওয়া যায়, যেমন রামায়ণেরমধ্য রাম-বনবাস, জটায়ুবধ, লঙ্কাযুদ্ধ—এইগুলি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। পটে আর যে সব আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, জন-প্রিয়তার দিক থেকে বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী সেগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। আর্দ্রবাতাস, জল ও জঙ্গলাকীর্ণ জমি, মানুষের কুটিলতম শত্রু সর্পকূলের নিবাস ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। মানুষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক বিভিন্ন দেশের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মানুষ নানা দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুকে আপন বুদ্ধি ও কৌশলে নির্বীর্য্য করেছে, জয় করেছে। কিন্তু হিংস্র, খল স্বভাব সর্পকূল বহুকাল পর্যন্ত মানুষের মনে গভীর ভয় মিশ্রিত রহস্যের উদ্রেক করেছে। ক্রীট দ্বীপে দেবীরূপে পূজিত হয়েছে, মিশরে

পেয়েছে দেবতার মর্যাদা। সেমিটিক্ জগতে গণ্য হয়েছে সয়তানের প্রতীকরূপে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ভীতিমিশ্রিত ঘৃণার সঙ্গে গণ্য হলেও বাংলার জলবায়ুতে সমৃদ্ধ সর্পকূলের উপদ্রব দুর্নিবার্য্য হয়ে উঠেছিল এক সময়। সেই সময়ে সমাজের সঙ্গে সর্পকুলের ঘোর-দ্বন্দ্বের পর সর্পেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। এই পরাজয়েরই চিহ্ন দেখি মনসাদেবীর পরিকল্পনা ও পূজার প্রচলনে, চাঁদসওদাগর ও বেহুলার কাহিনীতে। বাঙালী আপনার কল্পনা দিয়ে চাঁদ ও মনসার কাহিনীকে অপূর্ব কাব্য ও ভাবরসের সামগ্রী করে তুলেছিল। মধ্য-যুগের গীতিকাব্য মনসামঙ্গলে এবং বেহুলার পটগুলিতে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব সাজানো গৃহে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পুত্রহীনা নারীর বিলাপ ; পুরুষের চরিত্রে পিতার স্নেহ ও মানসিক দৃঢ়তার দ্বন্দ্ব, নব-পরিণীতা বধূর স্বামীভক্তি ইত্যাদির অপূর্ব বর্ণনা মাধূর্য্য চাঁদবেনে ও বেহুলার কাহিনীকে বাঙালী সমাজে এক অপূর্ব উপভোগের সামগ্রী করে তুলেছিল। আর এই কাহিনীর আশ্রয়ে ভক্তির দ্বারা প্রকৃতির অনিবার্য্য শক্তিকে বশ করবার যে প্রয়াস দেখা যায় আমাদের এই বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না। এই ভাব ও ভক্তি রসাত্মক কাব্যকাহিনী নিয়ে পটুয়া রঙ্ ও রেখা দিয়ে যে আলেখ্য রচনা কর'ত শিল্পবস্তু হিসাবে সেগুলিও অতুলনীয়।

মনসা-মঙ্গলের মত দেবীমাহাত্ম্য প্রচারে কমলে কামিনীর কাহিনীও বাঙলার লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ এবং মনসামঙ্গলের মত এই কাহিনীও পটুয়াদের আলেখ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই ছবিগুলিতে ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিংহলে যাওয়া, সাগরে কমলে কামিনী দর্শন, সিংহলপতির দেবী দর্শনের প্রয়াস ও অক্ষমতা, ধনপতির কারাবাস, পিতার অনুসন্ধানে পুত্রের আগমন, দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজার প্রচার। পটুয়া স্বকীয় উপকরণে অধিকতর উজ্জ্বলভাবে মানুষের মনে এঁকেদিতে সক্ষম হয়েছিল তার ছবির মারফৎ।

সংখ্যাল্প পটগুলির মধ্যে শিবের কাহিনী, চৈতন্যমঙ্গল, নরমেধ যজ্ঞের কাহিনীও কোন কোন পটুয়াকে উদ্বুদ্ধ করেছিল দেখা যায়। বাংলার পট চিত্রণের আদর্শ পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহের অনগ্রসর জন-সমাজকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। সাঁওতালদের আঁকা পটগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে এসে এরা হিন্দুপুরাণ কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করে। এদের আঁকা কোন কোন পটে কৃষ্ণজীবনলীলার কাহিনী ও অঙ্কিত দেখা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ছিল সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত মানব সমাজ সৃষ্টির কাহিনী। আদিম মানবও আদিম মানবী শুচিশুদ্ধ জীবনযাপন করত সেই আদিম যুগে। সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর সৃষ্টি বিস্তারের উদ্দেশ্যে একদিন তাদের জন্য একপাত্র সুরা রেখে দেন। সুরা পানের ফলে শুচিতা নষ্ট হয়; আদিম নরনারী সাত পুত্র ও সাত কন্যা লাভ করেন। একদিন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মধ্যে বিরোধ বাধল; বৃদ্ধ তার সাত পুত্র নিয়ে বৃদ্ধা ও সাত কন্যাকে ত্যাগ করে চলে গেল অনিশ্চিতের সন্ধানে। বহুদিন পরে ঘটনাচক্রে আবার যখন সেই পুত্র কন্যাদের সাক্ষাত হল সেদিন তাদের পরিচয় দেবার জন্য সেখানে তাদের পিতামাতা উপস্থিত ছিল না। এমনি করে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। এই সৃষ্টি সম্পর্কিত পট ছাড়া সাঁওতালদের মধ্য আর এক ধরণেব পটের সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজের কোন লোকের মৃত্যু হলে পটুয়া (সাঁওতালদের মধ্য এক শ্রেণীর পেশাদার পটুয়া আছে) সদ্য মৃত লোকটির একটা ছবি তৈরী করে; কিন্তু তাতে চোখ দুটি আঁকা বাকি রেখে সেই পটখানা নিয়ে মৃতের গৃহে এসে উপস্থিত হয়। বলে পরলোকে মৃতব্যক্তি চক্ষুর অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু উপযুক্ত মূল্য না দিলে তার পক্ষে মৃতের চক্ষুদান সম্ভব নয়। তখন মৃতের পরিবার উপযুক্ত অর্থমূল্য দিলে পটুয়া তার অসমাপ্ত কার্য শেষ করে পটখানি মৃতের পরিবারকে দান করে। পট থেকে মৃতের পরিজনবর্গ আত্মীয় বিয়োগ জনিত শোকে খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করে।

এছাড়া পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে এক ব্যাঘ্র দেবতার পূজার প্রচলন আছে। দেবতার নাম হিন্দুরা বলে 'দক্ষিণরায়'। মুসলমানরা বলে 'কালু।' উভয় সম্প্রদায়ের মধ্য এই ব্যাঘ্র দেবতা সম্বন্ধে নানারকম কিংবদন্তীর প্রচলন আছে। মুসলমান সমাজে গাজীর সঙ্গে সুন্দরবন (বাদ') অঞ্চলের রাজার সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই, সুন্দরবনের রাজার সৈন্যদলে ব্যাঘ্রের আবির্ভাব এবং শেষ পর্যন্ত গাজীর জয়লাভের গল্প নিয়ে ফরিদপুর এবং বরিশাল অঞ্চলের মুসলমান পোটোরা এক ধরণের পট আঁকে, তার নাম গাজীরপট। অনেক সময়ে বড় একখানা কাপড়ে বাঘের ওপর সোয়ার গাজী মিঞার ছবি এঁকে, সেই ছবিকে প্রচ্ছদপটরূপে টানিয়ে তার সামনে গাজী কালুর গল্প নিয়ে লেখা পালা গান গাওয়া হয়। এই ধরণের গানের আসর কিছুদিন আগে পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ (বাদা) বাংলার মুসলমানদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। এর নাম ছিল গাজীর গান। হিন্দুর দেবতা দক্ষিণরায়ই যে এই কাহিনীর বাদার রাজার আদর্শ এবং মুসলমান গুণী গাজীর হাতে তার নিগ্রহ বর্ণনাই যে এই আখ্যায়িকার মূল উদ্দেশ্য, গানের রচনা থেকে স্পষ্ট তা বোঝা যায়। বাদা অঞ্চলে আবাদ করবার জন্য সমাগত জনসমাজের সঙ্গে বাঘ ও কুমীরের সংঘর্ষ থেকেই এইসব গল্পের উৎপত্তি হয়েছিল এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

নাট্যমঞ্চের দৃশ্যপটের মত তৈরী যে গাজীর পটের উল্লেখ করা হ'ল সে ধরণের পট ছাড়া অন্য সব পটই লম্বায় বেশ বড় হ'য়ে থাকে। এতটা বড় হওয়ার দরুণ পটগুলির দুই মাথা দুই টুকরা লম্বা কাঠির সঙ্গে লাগিয়ে এগুলিকে জড়িয়ে রাখা হয়। এই জট যখন আস্তে আস্তে খোলা হয় তখন সমস্ত ছবিটা একসঙ্গে না বেড়িয়ে একটু একটু করে প্রকাশ পেতে থাকে। দেখাবার সময় পটুয়ারা মাটি থেকে একটু উঁচু ছবির কাঠামোর মত একটা চারপাইয়ের ওপর পটটা রেখে ওপরের কাঠিখানা নিয়ে আস্তে আস্তে পটটাকে খুলে বাঁহাত দিয়ে উঁচু করে ধরে। পটুয়ার উঁচুতে তোলা বাঁহাত থেকে চারপায়া

কাঠামোর ওপর পর্যন্ত যেটুকু দেখা যায় তার মধ্যে পরপর কয়েকটা দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। চওড়া করে আঁকা একটার বেশী রেখা দিয়ে পটের ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত চিত্রিত অঞ্চল একটার নীচে আর একটা করে অনেকগুলি অংশে ভাগ করা থাকে, চৌকোচৌকো করে। এই প্রত্যেকটা খোপে আঁকা থাকে পটের কাহিনী থেকে নেওয়া এক একটা দৃশ্য। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ঘটনাই পর পর এমনি করে সাজানো থাকে। পটুয়ারা পটের জট ছাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথার কাঠিটার সঙ্গে ওপরের অংশ জড়িয়ে নেয় আর ডান হাতে ধরা একটা লম্বা লাঠি দিয়ে পটের ওপরের দৃশ্যটা দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গান বা ছড়ায় গল্পটা বলে যায়। এ যেন আধুনিক কালের বর্ণনা (কমেন্টারি) দিয়ে ব্যাখ্যা করা ছায়াছবি ; বর্তমান সভ্যতার পরিবেশে এর বিশেষ কোন আকর্ষণ না থাকলেও প্রচণ্ড গতি ও দুর্দান্ত যন্ত্র যুগের আগেকার সামাজিক অবস্থায় এই পট এবং সেই পট দেখাবার পদ্ধতিতে যথেষ্ট উত্তেজনার উপকরণ ছিল সন্দেহ নেই।

পটে আঁকা ছবির রঙ ও রেখায় নিহিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া পট দেখানোর আনুসঙ্গিক গান আর ছড়াগুলিরও একটা বিশিষ্টতা দেখা যায়। পটের কাহিনীগুলি প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়ে থাকলেও ছড়া আর গানগুলি কোন পুরানো লেখা থেকে সংগ্রহ করা হ'ত না। যে যে ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে পট আঁকা হতো সেইসব ঘটনাকেই প্রধানত অবলম্বন করে শিল্পীরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মত ছড়া বা গান রচনা করে নিত। সমাজে নিম্নতম স্তরের লোকের পক্ষেও যাতে বুঝতে কষ্ট না হয় এমনি সরল ভাষায় লেখা হলেও ভাষার সরসতা গুণে ছড়াগুলি মহৎ সাহিত্যের মত গভীরভাবেই হৃদয়কে স্পর্শ করতো। সরল ও অনাড়ম্বর গ্রাম্য-ভাষায় লেখা গান ও ছড়াগুলি যে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মনে যথেষ্ট আবেগের সঞ্চার করতো এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রসের আবেগ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা ছাড়া এই পট এবং চিত্রের আনুসঙ্গিক ছড়াগুলিতে লোকশিক্ষার আবেদনও কম থাকতো না। পটগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অধিকাংশ পটের শেষ অংশে চিত্রিত যমালয় সংক্রান্ত ছবিগুলি দেখিয়ে মানুষের মনকে তার অনুষ্ঠিত কর্মের ভালমন্দ সম্বন্ধে সচেতন রাখা। ইহজগতে অনুষ্ঠিত কর্মের গুণাগুণ বিবেচনায় পরবর্তী জগতে মানুষের জন্যে যে বিচারের ব্যবস্থা আছে মানুষের মনকে সে সম্বন্ধে সজাগ রাখা ছাড়াও সাধারণভাবে পটের বিষয় নির্বাচনে এবং ঘটনাবিন্যাসেও লোক-শিক্ষার দিকেই দৃষ্টি রাখা হত বেশী। একদিকে প্রচলিত কাহিনীর জনপ্রিয়তা যেমন বিষয় নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করত তেমনি কাহিনীর অন্তর্নিহিত শিক্ষনীয় উপদেশটিকেই শিল্পী বড় করে লোকের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াস পেত।

প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণ কথার নানারকম কাহিনীতে যে সব গভীর ভাবব্যঞ্জনা, যে সব দার্শনিক তত্ত্ব এবং যে সব প্রেমভক্তি ইত্যাদি আদর্শের সমাবেশ দেখা যায় পটুয়ারা অনাড়ম্বর সহজ ভাষায় সেগুলিকে সাধারণের বোধগম্য করে প্রচার করত। এইজন্যই বড় দার্শনিক, কবি বা শিল্পী যে মর্যাদা লাভ করে থাকেন পটুয়ারাও সেই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার একটা অংশ অনায়াসেই দাবী করতে পারে।

পটুয়াদের বৈশিষ্ট্য যেমন, ছড়াগুলির ভাষার সারল্যে এবং হৃদয় গ্রাহীতায়, পটুয়াদের ছবির ঐশ্বর্যও দেখা যায় তেমনি বলিষ্ঠ রেখায় এবং উজ্জ্বল বর্ণে। গুপ্তরাজাদের আমলে ও তার কিছু পরে অজন্তাতে পাহাড়ের গুহার প্রাচীরে যে সব ছবি আঁকা হয়েছিল সেই ছবিতে রেখার প্রধান গুণ ছিল মানুষের দেহকে যথাযথভাবে উঁচু-নীচু এবং বর্তুলায়িত করে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। পরে মধ্যযুগ থেকেই রেখার এই বৈশিষ্ট্য আর বজায় থাকে নাই; ফলে ছবির গড়ন বর্তুলায়িত না হয়ে সমতল হয়ে পড়ে। রেখাগুলিও ক্রমে কোণ-বিশিষ্ট এবং তীক্ষ্ণ আকৃতি ধারণ করে। গুজরাটের পুঁথির চিত্রে, উড়িষ্যায়, বাংলাদেশের পুঁথির পাতায়, সুদূর ব্রহ্মের

প্রাচীরে আঁকা ছবিতে এই কোণালো তীক্ষ্ণতারই প্রাধান্য দেখা যায়। চিত্রগঠনের একটা বিশিষ্ট ধারাই যে ঐ ধরণের কোণালো রেখার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। বাংলার পটগুলিতে কিন্তু এই ধরণের কোণালো রেখার কোন অস্তিত্ব নাই। এই ছবির রেখাগুলি বেশ টানা আর জোরালো; কোণালো রেখার মত ধরে ধরে আঁকা নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে লম্বালম্বা টানে শেষ করা। দেহকে উঁচু-নীচু করে সৃষ্টি করার ক্ষমতা না থাকলেও এই রেখা দেহসীমাকে পুষ্ট ও মার্জিত রূপ দিতে সক্ষম হত। এমনি করে দেহগত সৌন্দর্যের নানা ধাঁচ এবং চোখ ও মুখের একটা ভাবসমৃদ্ধ রূপ সৃষ্টি করতে এই রেখা যে সফলতা লাভ করেছিল তার তুলনা অন্য ছবিতে বড় একটা পাওয়া যায় না।

পটুয়ার রঙের ভাণ্ডার শুধু অফুরন্তই নয়, নানা বৈচিত্র্যেও এই ভাণ্ডার পূর্ণ। এইসব রঙ আগে পটুয়ারা নানা খনিজ বা উদ্ভিদ থেকে ঘরেই প্রস্তুত করে নিত। উজ্জ্বল লাল, ফিকে হরতেল, মিশমিশে কালো, মাজা নীল, এমনি কয়েকটি রঙের সমাবেশে পটুয়ারা তাদের পটের বর্ণবিন্যাস সমাপ্ত করত। পটুয়াদের বাহাদুরী শুধু উজ্জ্বল রঙের সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা; এই রঙকে মেজে নানা রঙকে মিলিয়ে বর্ণের ঐক্যতান সৃষ্টির মধ্যেও তাদের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। রঙের সামঞ্জস্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ছবির গঠনসজ্জাতেও পটুয়ার কৃতিত্ব কম ছিল না। কৃষ্ণলীলা পট বা বেহুলা পটের মধ্যে বিন্যস্ত আঁকাবাঁকা নদীরেখায়, খোপে খোপে নানা রকমের দৃশ্য সৃষ্টিতে পটুয়ারা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তার তুলনা পাওয়া সহজ নয়।

ক্রমাগত ব্যবহার হ'ত ব'লে পটগুলি খুব বেশীদিন স্থায়ী হত না। সাধারণত কাপড়ের ওপর কাগজ লাগিয়ে তার ওপর ছবিগুলি আঁকা হ'ত। একটা পট দেখানোর পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে পটুয়া আবার একটা নূতন পট এঁকে নিত। এই নূতন পট এঁকে নেওয়ার সময় শিল্পী যথাসম্ভব পুরানো পটের রেখা, রঙ এবং চিত্রবিন্যাসের গতানুগতিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করত। যদিও প্রত্যেকবার নূতন

পট নির্মাণে পুরানো পটের কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে যেত, পটুয়ার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে বা তার অজানিত ভাবে।

এমনি করে ধারাবাহিক ভাবেই পট রচনার এই সংস্কৃতি এদেশে চলে এসেছে। এই ধারাকে অবলম্বন করে বর্তমানকাল থেকে অতীতের দিকে ফিরে গেলে এই পট রচনা' গতানুগতিকতার একটা অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। পটুয়ারা তাদের কূলগত সংস্কার থেকে নিজেদের সম্বন্ধে যে কাহিনী বলে পটশিল্পের ধারাবাহিকতায় তার সমর্থন আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে এদেশে এই ধরণের পট দেখাবার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামায়ণে রাজপ্রাসাদের চিত্র-সজ্জিত গৃহের উল্লেখ আছে। এই ঘরের সংগৃহীত ছবি পটচিত্রের অনুরূপ না হলেও একদিক থেকে ঐসব ছবির সঙ্গে পটচিত্রের মিল ছিল—ঐ ছবিগুলিও অপ্রয়োজন কালে জড়িয়ে রাখা হত। এই ধরণের জড়ানো পটের প্রচলন এদেশে যে যথেষ্ট প্রাচীন, বৌদ্ধ সাহিত্য থেকেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যে এক ধরণের ছবির উল্লেখ আছে যেগুলি 'চারণ চিত্র' বলে পরিচিত ছিল। নাম থেকে মনে হয় এই ছবি হালের পটের মতই আস্তে আস্তে জট ছাড়িয়ে দেখান হোত। তবে এখোনকার মত এই পটগুলির সবই উপর থেকে না খুলে বোধ হয় কোন কোনটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে খোলা হ'ত; অর্থাৎ পটগুলি উপর থেকে নীচে লম্বা না হয়ে বাঁ থেকে ডাইনে লম্বা হোত। অনেকে মনে করেন, এই ধরণের আড়াআড়ি পটেরই ছাপ পড়েছে ভরহুত এবং সাঁচীর বিখ্যাত তোরণের ওপরকার নানা চিত্রে শোভিত পাথরের কড়িগুলির ওপরে; দুর্গা প্রতিমার 'চালচিত্রের' গঠন এবং চিত্র লক্ষণের সঙ্গে এই 'চারণচিত্রের' হয়ত কিছু যোগাযোগ আছে। আর ওপর থেকে নীচে লম্বা পটের অনুসরণ দেখা যায় তোরণের দু'পাশের স্তম্ভগুলিতে। রচনা-কৌশলের দিক থেকে দেখলে এই দুই ধরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। আড়াআড়ি লম্বা

চিত্রগুলিতে বিষয়বিন্যাস দেখা যায় একটানা; কোন রকম খোপ খোপ না করেই দৃশ্যগুলি পরপর সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে; কিন্তু স্তম্ভগুলির গায় দৃশ্যগুলি একের পর এক বিভিন্ন চৌকো চৌকো খোপের মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। তবে বর্ণনার ভঙ্গীতে এই উভয় ধরণের উপরেই পটচিত্রের প্রভাব আছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

এরপর কালিদাসের রচিত নানা নাটকে এবং ভবভূতির উত্তর রামচরিতে পট রচনা ও পট প্রদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশাখ-দত্তের মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে 'যমপট্টিক' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আধুনিক কালের 'যমপট' কথার ঐটিকেই প্রাচীনতম উল্লেখ বলে মনে করা যেতে পারে। মুদ্রারাক্ষসের রচনাকাল নিয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও একথা সুস্পষ্টই বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর 'যমপট্টিকের' সঙ্গে জনসাধারণের যথেষ্ট পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বাণভট্টের রচিত হর্ষচরিতের যমপট ব্যবসায়ী পটপ্রদর্শকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হর্ষচরিতের বর্ণনাটি এইরূপ ; সম্রাট প্রভাকরবর্ধন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর পীড়ার সংবাদ শুনে যুবরাজ রাজ্যবর্ধন তাড়াতাড়ি শিকার ত্যাগ ক'রে নগরে ফিরে এলেন। রাজপুরীতে প্রবেশের পথে এক পটপ্রদর্শককে তাঁর নজরে পড়ল ; পটুয়াটি এক গাছের তলায় বসে পট দেখাচ্ছে ; তার চারিদিকে নানা বয়সের লোক জড়ো হয়েছে—তবে বালকই বেশী। সেই পটে মহিষারূঢ় যম-রাজের মূর্তিই প্রধান। তারপর অনেক মূর্তি আছে। সেই সব মূর্তি দেখিয়ে পটুয়া জীবনের অনিত্যতা ও পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুর সম্পর্কের অসারতা সম্বন্ধে লোককে সচেতন ক'রে দিচ্ছে। বাণ রাজ্যবর্ধনকে তাঁর পিতার অন্তিমকালের জন্য প্রস্তুত করবার কৌশল হিসেবে এই যমপট্টিকের অবতারণা কর্‌লেও 'যমপটের' অস্তিত্বের প্রাচীনতার দিক্ থেকে এই ছবিটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বাণ নিজে তাঁর জীবনে বহুবার এই ধরণের পট প্রত্যক্ষ করে না থাক্‌লে তাঁর এই বর্ণনা এতটা সজীব ও প্রাণবন্ত হতে

পারত না। আরও উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এই বর্ণনা আধুনিক কালের পটুয়াদের সম্বন্ধেও অনায়াসে প্রযোজ্য হতে পারত। যেন বর্ষার পর মেঘমুক্ত আকাশের তলায় কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে আমাদের ছোটবেলায় দেখা কোন পটুয়ার ছবি দেখ্‌ছি।

পটশিল্পীদের এই রীতিটি কেবল বাংলার নিজস্ব নয়; যদিও যমপট এই কথাটা বোধ হয় বাংলায়ই বেঁচে রয়েছে, আর কোথাও নেই। ঠিক বাংলার মত না হলেও, গুজরাট অঞ্চলে এক ধরণের পটুয়া আছে, তাদের বলা হয় 'চিত্রকথী'। এরাও বাংলার সমব্যবসায়ীদের মত পট দেখিয়ে বেড়ায়; এই পটের আকৃতি অনেকটা প্রস্থে দেড় বা দুই হাত ও লম্বায় আট দশ হাত বা বেশী; তবে চিত্রের গঠনভঙ্গীর দিক্ থেকে এই ছবিগুলি যেমন স্বতন্ত্র, এর বর্ণবিন্যাসের কায়দাও একটু বিশিষ্ট। সাধারণত এই চিত্রকথিরা মহাভারতের উপাখ্যান নিয়েই চিত্র রচনা করে। এরাও চিত্রপ্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে গানের সুরে ছড়া আবৃত্তি করে। জাতিতে এইসব চিত্রকথিরা ব্রাহ্মণ। বাংলার পটুয়াদের মতই গুজরাটের এই চিত্রকথিরাও তাদের জাত ব্যবসা ছেড়ে অন্য পেশা অবলম্বন ক'রেছে।

দক্ষিণ ভারতেও বাংলার পটের মত ছবির ব্যবহার আছে। তবে এসব ছবি দেখিয়ে পটুয়াদের মত কোন সম্প্রদায় গান বা ছড়া আবৃত্তি ক'রে বেড়ায় না। এক ধরণের পট আছে যাতে রঙিন কাপড় কেটে সাদা কাপড়ের উপর লাগিয়ে ছবির সৃষ্টি করা হয়। এই ধরণের পটে রামায়ণ কাহিনীর প্রাধান্য দেখা যায়। চৌকো আকারে কাটা টুক্‌রো টুক্‌রো এই ধরণের ছবি একটার পর একটা সাজিয়ে রাখা হয়। এই ছবি দেখাবার কৌশলটা ঠিক বাংলার লম্বা গুটানো পট দেখাবার মত নয়, অনেকটা পাতা উল্টে উল্টে পুঁথি পড়ার মত।

চিত্রপট রচনা মানুষের আনন্দ ও শিক্ষাবিধানের জন্য। চিত্রপটের ব্যবহারে সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মনন ও কল্পনার দ্বারা মানুষ জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে বহু সত্যের

পরিচয় লাভ ক'রেছে। দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলায় এই সব সত্যের প্রকাশ দেখা যায়। যাঁরা নিজের জীবনে নানা উন্নতস্তরের উপলব্ধির উপকরণের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরাই যুগেযুগে এই সবের সাহায্যে তাঁদের লব্ধজ্ঞানের আভাস অন্যান্য মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা ক'রেছেন। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনন অত্যন্ত জটিল হ'য়ে উঠেছে; যে স্তরে যে সব সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় সমাজ তা অনুরূপ জটিল দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলার ভেতর দিয়ে গ্রহণ করে। কিন্তু সমাজে সব মানুষ একই সময়ে সমান উন্নত অবস্থায় উপনিত হতে পারে না। সেই জন্যই এই সমস্ত উন্নত স্তরের উপলব্ধ সত্যকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য উপযুক্ত সরল আধারের প্রয়োজন হয়। সাধারণের সঙ্গে সংযোগের জন্য সাধারণের বোধগম্য সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রভৃতি প্রয়োজন। উন্নত ও জটিলতায় অভ্যস্ত মন যে অলঙ্কার আর আড়ম্বরের ভেতর দিয়ে রস ও সত্যকে গ্রহণ করে সাধারণ লোক তার মধ্যে খেই হারিয়ে ফেলে সহজেই। তাদের জন্য সরল ও অনাড়ম্বর করে সাহিত্য ও শিল্পকলার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়।

পটুয়াদের রচিত ছড়া এবং গানে ভারতীয় দর্শনসমূহে উপলব্ধ নানা উন্নত স্তরের তত্ত্বকথা যেমন অনায়াসে সাধারণের বোধগম্য হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের ভক্ত ও সাধকদের ভাষার সঙ্গেই শুধুমাত্র তার তুলনা চলতে পারে। নিতান্ত নগণ্য এবং সাধারণ লোক এই পটুয়ারা ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় সাংস্কৃতিক সত্যকেই এমনি ভাবে লোকসমাজে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। শুধু অনাড়ম্বর ভাষায় ছড়া রচনা করেই নয়, বর্ণ ও রেখায় বর্ণিত আখ্যায়িকাগুলিকে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তুলে তারা জনসাধারণের মনে স্থায়ীভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ক'র্তে সক্ষম হ'য়েছিলেন। জনসাধারণের সংস্কৃতির বাহন হিসাবে এই পটচিত্রের কোন তুলনা পাওয়া যায় না। সমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আজ আর পটুয়াদের কোন প্রয়োজন হয় তো নাই। কিন্তু বহু প্রাচীনকাল থেকে সমাজকে তারা যে সেবা করে

এসেছে তার কোন প্রতিদান তারা পায় নি। ভারতবর্ষের পুণ্য মৃত্তিকায় যুগেযুগে মহাপুরুষেরা যে সব চিরন্তন ও মহৎ সত্যের সন্ধান পেয়েছেন ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে সেগুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সঞ্চয়।

এই সব সত্যকে জনসাধারণের মধ্যে ছ'ড়িয়ে দেবার জন্য রচিত হয়েছে উপনিষদ আর দর্শন; রচিত হয়েছে মহাভারত, রামায়ণ, নানা পুরাণ, আখ্যায়িকা; গড়ে উঠেছে অজন্তার চিত্রশিল্প, মথুরা সারনাথ ইত্যাদির ভাস্কর্য। মহাপুরুষদের অনুভূত জ্ঞান যেমন সমাজের উন্নত স্তরের ব্যক্তিদের পক্ষে সত্য তেমনি তার প্রয়োজন রয়েছে নীচুস্তরের সাধারণ লোকদের জন্যও। উপনিষদের উপলব্ধি গীতায় ও মহাভারতে, রামায়ণ ও পুরাণে অবশেষে মধ্যযুগে সাধু মহাপুরুষদের বাণী ও সঙ্গীতে সহজ ও সরলতর হয়ে সাধারণের সমাজে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছে। সংস্কৃতিকে সকলের পক্ষে সহজলভ্য করবার এই প্রয়াসই দেখতে পাই নাটক, যাত্রা, কথকথা ইত্যাদিতে। কিন্তু একাধারে সঙ্গীত ও চিত্রফলকের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতির উচ্চতম আদর্শগুলির প্রচারের যে সুযোগ পটুয়ারা সৃষ্টি করেছিল তা সত্যই অতুলনীয়।

আজ চিত্রশালাগুলিতে পটুয়াদের কাজের কিছু কিছু নিদর্শন সংগৃহীত হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনে তাদের প্রয়োজন আজ সমাজে আর নেই। তা'হলেও যুগযুগ ধরে এই পটুয়ারা তাদের দারিদ্র্য ও অভাবের ভেতর দিয়ে সমাজকে যে সেবা করে গেছে তার জন্য তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। চিত্রিত পট ও রচিত ছড়াকে যথাসম্ভব যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে ও সে সম্বন্ধে আলোচনা করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা প্রয়োজন।

এই পটচিত্রের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্কে সংযুক্ত আর এক শ্রেণীর ছবির কথাও এই প্রসঙ্গে না বলে পারা যায় না। নানা বিষয় বস্তু নিয়ে লেখা পুঁথির পাতায় এবং মলাটের কাঠের পাটার উপরে এই সব ছবি আঁকা হত। চিত্রখচিত পুঁথি লিখবার প্রচলন

ভারতবর্ষে যে বহু প্রাচীন কাল থেকেই হয়েছিল এবিষয়ে অনেক প্রমান পাওয়া যায়। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে পুঁথি এবং পটচিত্র যে খুব উন্নতি এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা নেপাল ও তিব্বত থেকে সংগৃহীত এবং বর্তমানে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ শালায় রক্ষিত বাংলার পাল রাজাদের আমলে লেখা কয়েকখানি পুঁথি থেকে তার প্রমান পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে কবে লিখন পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সিন্ধুতীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর আবিষ্কারের পূর্বে পণ্ডিত সমাজে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি পশ্চিম এশিয়ার কোন বিশিষ্ট লিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং সম্রাট অশোকের আবির্ভাবের অল্প কিছু কাল আগে থেকে এই সব লিপি এদেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে এই মতবাদ আর তেমন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে স্মৃতি বিধৃত সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকলেও প্রাচীন ভারতের বিপুল সাহিত্য যে কেবল মাত্র স্মৃতি পথেই পুরুষ পরম্পরায় রক্ষিত হয়ে ছিল একথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। ফলে এই অনুমানই অধিকতর যুক্তি সহ মনে হয় যে পুঁথি রচনার রেওয়াজ ও ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য পাল আমলের পূর্বেকার কোন পুঁথি এখন পর্যন্তও ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি ; তবে মধ্য এশিয়া থেকে খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত ভারতীয় হরফে লেখা পুঁথির অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপাল এবং তিব্বত থেকে পাওয়া পাল আমলের যে সব পুঁথির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তার অধিকাংশই তালপাতার উপরে লেখা। এই সব তাল পাতায় লেখা পুঁথি ছাড়া খ্রীষ্টিয় ১১০৫ অব্দে নেপালে প্রচলিত একখানি কাগজে লেখা পুঁথি আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহে রক্ষিত আছে। এই সমস্ত পুঁথির প্রায় সবগুলিই তান্ত্রিক বৌদ্ধ

ধর্মের পুঁথি ; নানা মন্ত্র-তন্ত্র এবং সাধন প্রণালী সম্বলিত এই সব পুঁথির কোন কোনটিতে অতি অপূর্ব উজ্জ্বল বর্ণের ক্ষুদ্রকায় ছবি, পুঁথি গুলিকে ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশিষ্ট করে রেখেছে। বিষয় বস্তুর দিক থেকে এই সব ছবিতে বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি বা বুদ্ধদেবের জীবন থেকে গৃহীত নানা দৃশ্যই প্রধান। তালপাতা বা কাগজের উপরের বর্ণ সম্পাতের কৌশলটি বিশেষভাবেই প্রণিধান যোগ্য। যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং কলা-কৌশল প্রাচীন ভারতের প্রাচীর চিত্রকে বিশিষ্ট করে রেখেছে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও পুঁথির ছবিগুলিও অনুরূপ গুণে সমৃদ্ধ। পুঁথির কাঠের পাটা বা পাতার খানিকটা অংশ, প্রায়শই চৌকো কখনও গোল করে চিহ্নিত করে নেওয়া হত। তারপর এই অংশটি কোন বিশিষ্ট কৌশলে এবং খড়িগুড়োর মত কোন উপকরণে মার্জিত করে বর্ণ গ্রহণের উপযোগী করে তোলা হত। পরবর্তী স্তরে খুব সূক্ষ্ম তুলির সাহায্যে অতুলনীয় সাবলীলতা ও সুদক্ষ বিন্যাস কৌশলে রেখাগুলিকে ফুটিয়ে তোলা হত। রেখাগুলি বিন্যস্ত হওয়ার পর অতি যত্নে এবং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ধ্যান সম্মত বর্ণের দ্বারা রেখা সীমায়িত অংশগুলিকে শিল্পীরা পরিপূর্ণ করে তুলতেন। রেখার সুষমা এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা ছাড়াও এই ক্ষুদ্রায়তন চিত্রের যে গভীর এবং অভূতপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা ছিল চিত্রানুরাগীমাত্রই তা স্বীকার করেন এই চিত্রের রূপকারদের শিল্প জগতে প্রভূত সম্মানের আসন দিয়েছেন। পূর্ব ভারতের এই স্বল্পায়ত চিত্রকলা পৃথিবীর চিত্র শিল্পের জগতে এক বিস্ময়জনক সৃষ্টি !

এই প্রাচীন পুঁথি-চিত্রেরই বিবর্তন দেখা যায় পরবর্তী যুগের পাটা এবং পুঁথির চিত্রে। প্রাচীন গুজরাটে এবং পরে রাজস্থান, উড়িষ্যা ও বাংলা অঞ্চলে পুঁথি-চিত্রের প্রচলন ক্রমবিবর্তন লাভ করেছিল। বাংলায় এই পুঁথি-চিত্রের বিবর্তনের রূপটি অনুধাবন করতে হলে বিশেষ করে আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহের সাহায্য নিতে হয়। এ ছাড়া স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এবং গুরুসদয় দত্ত ও কিছু চিত্রিত-পুঁথি এবং পুঁথির সংগ্রহ করেছিলেন। উড়িষ্যাতে যেমন

তালপাতার উপরে আঁকা ছবির ব্যাপক প্রচলন আছে বাংলায় তেমনটি পাওয়া যায় নাই। এখানকার অধিকাংশ পুঁথিই কাগজে লেখা এবং ছবি আঁকা কাগজের পুঁথি বড় একটা পাওয়া যায় নাই; তবে মুর্শিদাবাদের একটি বৈষ্ণব আখড়া থেকে পাওয়া দেবনাগরী হরফে লেখা তুলসীদাসের একখানি সচিত্র রামায়ণের অফুরন্ত ছবি বাংলা দেশের চিত্ররীতির একটি উল্লেখযোগ্য প্রমান হিসাবে আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। পুঁথিটি মহিষাদলের রাজপরিবারের রাণী লছিমা দেবীর জন্য প্রয়াগ থেকে আমন্ত্রিত জনৈক দ্বিজ ইছারাম মিশ্র ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। কিন্তু ছবিগুলি যে নিতান্তই বাংগালী চিত্র শিল্পীর হাতে আঁকা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই ছবির রেখা বিন্যাস, বিষয় সজ্জা এবং বর্ণ সম্পাতে উড়িষ্যা ঘেঁষা মেদিনীপুরের একটি বিশিষ্ট চিত্ররীতিরই রূপ প্রতিফলিত দেখা যায়। বাংলার তথা ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে এই চিত্রিত তুলসী রামায়ণটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপকরণ। বর্ণের ঐক্যতান, রেখার মাধুর্য্য এবং সেই সঙ্গে বর্ণ বিন্যাসের ইঙ্গিতময় কলা-কৌশল এই পুঁথির ছবিগুলিকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। এই তুলসী রামায়ণের সঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে আশুতোষ মিউ-জিয়ামে সংগৃহীত আরও কয়েকটি পাটার কথা। এই পাটাগুলি কাঠের তৈরী এবং পুঁথির মলাট হিসাবে ব্যবহারের জন্য তৈরী হয়েছিল। এই পাটাগুলির গায় নানা বিষয় বস্তু নিয়ে আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি ছবি আর চৈতন্য চরিতামৃতের কয়েকটি আলেখ্য। সিঁন্দুরে লাল, মাজা হলুদ এবং উজ্জ্বল নীল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ছবিগুলি নিখুত; বিষয় বিন্যাসে, দেহগত লালিত্যে ও দৃঢ়তায় এবং পর্যাপ্ত পরিশীলনের আনুকূল্যে--ছবিগুলি সমৃদ্ধ। একদিকে এই ছবিগুলি বাংলার প্রাচীন পুঁথি চিত্রের উত্তরাধ্যায়ী; অন্যদিকে বাংলার বিশিষ্ট এবং প্রাণরসে পূর্ণ পটচিত্রের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। গীতিকবিতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আঁকা এই ছবিগুলিতে

গীতি কবিতার প্রাণধর্ম নিগূঢ় ভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বিষয় নিয়ে আঁকা ছবি কখানার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রজগোপীনীদের সঙ্গে নৃত্যরত একাধিক কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে যে লাস্যময় নৃত্যচ্ছন্দ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। বাঁকুড়ার মল্লভূমির রাজা বীর হাম্বীরের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের সাক্ষাৎকার ও হাম্বীরের রাজসভার আলেখ্যে শিল্পীর নিপুন পর্য্যবেক্ষণের কৃতিত্ব এবং দৃশ্যবিন্যাসের কৌশল প্রভৃত প্রশংসার দাবী রাখে।

বাঁকুড়ার এই পুঁথি চিত্রের সঙ্গে গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত তাস খেলার জন্য তৈরী চিত্রিত তাসের কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। এই তাস নানা উপকরণ দিয়ে গোলাকৃতি কাগজের টুকরো কে শক্ত করে নিয়ে তাই দিয়ে তৈরী হত। তাসের উপর হিসেবের জন্য ইউরোপ থেকে আমদানী করা রাজ, রাণী, গোলাম ইত্যাদির পরিবর্তে দশাবতারের ছবি এবং ভিন্ন ভিন্ন অবতারের আয়ুধ ব্যবহার করা হত। রেখায় এবং রঙে তাসের এই ছবিগুলি প্রচলিত পট-শিল্পের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে বিশিষ্ট। উড়িষ্যায়ও এই ধরণের তাসের প্রচলন আছে। সেখানে এই তাসকে গঞ্জিফা বলা হয়।

তাসের ছবির এই ঢং ও ছন্দের সঙ্গে নানা ধরণের ছবিরও সাযুয্য লক্ষ করা যায়। এইসব ছবিকেও সাধারণ ভাষায় পট বলা হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এই ধরণের পটের বহুল প্রচলন ছিল। চৌকো ধরণের কাগজের উপরে এই সব পট আঁকা হত। বর্ণের বিন্যাস এবং রেখার কারু কৌশলে এই সব পট, গুটোনো পট, পুঁথি এবং তাসের ছবিরই নিকট সগোত্র। কিন্তু বিষয় বিন্যাসে এই সব পটে কিছু অভিনবত্ব দেখা যায়। সাধারণত প্রচলিত ধারার ছবি ধর্মীয় বিষয় বস্তু এবং দেবদেবীর লীলা নিয়েই আঁকা হত। বোধ হয় সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই রীতি প্রচলিত ছিল। অতীতে বুদ্ধ, জৈন তীর্থঙ্কর এবং পুরানোক্ত দেব-দেবীর লীলা ইত্যাদি নিয়েই ছবি আঁকা হত। বাংলার প্রচলিত

পটেও এই ধারাই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলের চৌকো পটে সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা ছবির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই সব ছবিতে রেখা ক্রমেই মোটা এবং দৃঢ় বিন্যস্ত হতে থাকে ; হাল্কা বা ভারী রঙ পোচড়া দিয়ে রেখা সীমায়িত অংশ পূর্ণ করে ছবি সমাপ্ত করা হত। এই সব ছবিতে চিত্র ধর্ম যেন ক্রমেই রেখা নির্ভর বা রেখা সর্বস্ব হয়ে পড়ছিল ; রঙ এই সব ছবিতে গৌণ। বোধ হয় চাহিদার ব্যাপকতার জন্যই শিল্পীরা দ্রুত ছবি আঁকতে বাধ্য হয়েছিল ; এবং অসংখ্য ছবি খরিদ্দারদের যোগান দিতে গিয়ে তাদের দ্রুত রেখাঙ্কনে পারদর্শী হয়ে উঠতে হয়েছিল। অনেক সময় মূল শিল্পী (গুণী) ছবির রেখাগত কাঠামোটা ছকে দিলে শিষ্যেরা বর্ণবিন্যাস করে ছবিকে সমাপ্ত করত। এক সময় এদেরই কোন কোন সগোত্র কালীঘাটে এসে জমায়ত হয় ; কালীঘাট ইংরাজ আমলের প্রথমদিকে তখন বেশ জমে উঠেছে, বহু জনের আগমনে মুখর তীর্থ ক্ষেত্ররূপে। এখানে ছবির বেশ চাহিদা। তীর্থ যাত্রীরা মায়ের মন্দিরে পূজা দিয়ে প্রত্যাবর্তন পথে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে নানা উপকরণের সঙ্গে একখানি পট। মা কালীর ছবি আঁকা পটের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন উৎসাহী যাত্রী হয়ত সামাজিক বিষয় বস্তু নিয়ে আঁকা ছবির দিকেও ঝুঁকল। অসংখ্য তীর্থযাত্রীর জন্য ছবির চাহিদা ছিল বিপুল ; একে একে বেশ কয়েক ঘর পটুয়া এসে কালীঘাটে ঘর বেঁধে বসেছিল। তাদের আঁকা ছবিও ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দূরান্তে। এই ছবির রেখার ধর্ম ছিল নিতান্তই বাংলার পটচিত্রের অনুগামী ; যেখানে বর্ণ সঞ্চার করা হত সেই বর্ণও ছিল প্রধানত পটচিত্রেরই অনুগামী কিন্তু বিষয়বস্তু এবং বিন্যাসে যে ঢং আত্মপ্রকাশ করেছিল তা অবিমিশ্র পটাশ্রয়ী থাকেনি। এই চিত্রকলা নিয়ে সম্প্রতি বৈদেশিক অনুরাগীমহলে কিছু আলোড়ন দেখা দিয়েছে। 'বাজার চিত্রকলা' নামে পরিচয় দিয়ে কালীঘাট পটের যে সাম্প্রতিক পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে নানা কারণেই তা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। (Bazar Painting by W. B.

Archar), প্রধানত এই নিবন্ধের লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রথাগত চিত্রকলার বিশেষ করে বাংলার পটচিত্রের প্রবহমান ধারার কোনই পরিচয় আছে বলে মনে হয় না। দিল্লীর মুঘল রাজসভার চিত্রকরদের সঙ্গে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের কিছু অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, পরে লক্ষ্ণৌ এবং পাটনায় এ ধারা অনুসরণ করে ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত চিত্রশৈলীর উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু গ্রাম-বাংলার চিত্রধারার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার সুদূর সম্ভাবনাও কল্পনা করা যায় না। ইউরোপীয় সন্ধানী দৃষ্টি কিন্তু কালীঘাটের পটে ইউরোপীয় প্রভাবের সন্ধান লাভ করেছে। 'পট' শব্দটি ধ্বনি মাধুর্যে বাঙ্গালীর চিত্তে যথেষ্ট অনুরাগের সঞ্চার করে ; এই ধারার চিত্রকলাকে 'বাজার চিত্রকলা' নামে অভিহিত করাও বেশ উদ্দেশ্য মূলক বলেই অনুমান হয়।

কালীঘাটের পট বাংলার প্রবহমান চিত্রধারার শেষ প্রবাহ। প্রবল প্রাণবন্যায় এই চিত্রধারা অষ্টাদশ শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর চিত্তকে প্রভূত পরিমাণে রসসিক্ত করে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছিল। এই ধারাবসানে বাংলার প্রবহমান সংস্কৃতি ধারার পূর্ণচ্ছেদ সূচিত হল।

বাংলার কাঁথা ও আলপনা

দিগন্ত-বিস্তৃত ধানক্ষেত, শ্লথ শিথিলগতি নদী, ইতস্তত বৃক্ষ-লতা, ঝোপজঙ্গল—এই পরিবেশে বাংলার পল্লীজীবন চলে আসছে বহু শতাব্দী থেকে—নিস্তরঙ্গ জলের মত পরিবর্তনহীন—বাইরেকার বিপুল পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায়। নিজেদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা নিয়েই ছিল জগৎ; প্রচুর ধন-ঐশ্বর্য যেমন ছিল রূপকথার সামগ্রী সাধারণ আহার-বিহারে সচ্ছল জীবনের অভাবও তেমনি ছিল অজ্ঞাত। এই সমাজের আবেষ্টনীতে সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি কোন বৃহৎ চেতনা ও তেমনি একে তেমন ভাবে আলোড়িত করেনি। সেই জন্যই এই সমাজের সাহিত্যে বা শিল্পে উল্লেখযোগ্যরূপে মহৎ বা তুলনায় অদ্বিতীয় তেমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিবর্তনহীন গতানুগতিক এই জীবনে আনন্দ কিম্বা বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব কখনও অনুভূত হত বলে মনে হয় না। সমাজ তার এই জীবনের মধ্যেই নিজের স্বভাব এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানা ধরণের সৌন্দর্য ও সুখের উদ্ভাবন করেছিল। এই সুখ ছিল পরিজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে দিনান্তের বিশ্রম্ভালাপে লোককথা গান ও শ্রবণে, পার্বন এবং মেলার উল্লাসে, তীর্থপর্যটন এবং বিশ্রামে, সৌন্দর্যের যোগান দিত মন্দিরের রূপ ও প্রাচীর সজ্জার সমারোহ পূজা এবং ব্রতের আলিপন ও গৃহসজ্জা দৈনন্দিন ব্যবহারের নানা টুকিটাকি, পুতুল, প্রতিমা, হাঁড়ি-সরা, সিকে-কাঁথা, পাটি-মাদুর। এই পরিশীলিত সুখ ও সৌন্দর্যের উৎস ছিল জীবনের প্রাচুর্য এবং প্রাণকেন্দ্র ছিল গূঢ় ধর্মপ্রবণতা। দৈনন্দিন গহজীবনের ক্ষুদ্র ক্রয়-বিক্রয়, বাণিজ্য, চাষবাস আর মাছধরা নিয়ে গ্রামনির্ভর এবং বাইরেকার সংস্রব চ্যুত সমাজের জীবন রসাস্বাদনের এই উপকরণ

স্বল্লায়তন হলে ও এর মধ্যে রসমাধুর্য এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য কিছু কম ছিল না, এই জীবন পরিবেশ কল্পনার যে অপূর্ব রূপজাল সৃষ্টি করেছিল, মধ্যযুগের সাহিত্যে এবং মন্দিরগুলির প্রাচীরের গায় লাগান খোদাই করা ইটের কাজে তার পরিচয় খুব ভাল ভাবেই দেখা গেলেও অতি সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও এই কল্পনার ঐশ্বর্য কত বিস্তৃত ছিল, তার সন্ধান পাওয়া যায় কাঁথা আর আলপনার নক্সায়। এই কাঁথা-শিল্পে নারী মনের যে গভীর রূপবোধ, চিরাচরিত সংস্কৃতির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং কল্পনা বিলাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সমাজের নারীদের মধ্যে অজ্ঞাত। এদেশের পিতামহী মাতামহীরা কল্পনারসের অফুরন্ত ভাণ্ডার রূপে এদেশের শিশুমনকে চিরকাল আনন্দে অভিষিক্ত করে এসেছেন; এঁরাই ছিলেন দেশের সুপ্রাচীন অতীতের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। এঁরাই নানা রকমের রূপকথা আর গল্প প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে অতীতের নানা ঘটনা, ইতিহাসের কত উল্লেখযোগ্য কাহিনীর স্মৃতি জাগরূক রেখে শিশুদের বীর, হাস্য, রৌদ্র, করুণ নানা রসের দোলায় আন্দোলিত করে এদেশের মাটি জল বাতাসের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতেন। এঁদের কাছে ইতিহাস পুরাণের কাহিনী ঝাপসা হয়ে গিয়ে থাকলেও—পুরাণ-কথার মূলশিক্ষাকে সৌন্দর্যানুভূতির রসে জীর্ণ করে যে অপূর্ব উপকরণ রচনা করতেন, জনগণের মানসিক পুষ্টি ও ধৃতির উপজীব্য হিসাবে তার মূল্য ছিল অনতিক্রমণীয়।

নারী সমাজে রূপ-কল্পনার এই বিস্তৃতি এবং চিরাচরিত সংস্কৃতি-ধারার সঙ্গে যোগসূত্রের এই পরিচয় আরও নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যায় কাঁথা-শিল্পের মধ্যে, দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে টুকরো ছোট-বড় কাপড়ের ব্যবহার সকল জাতির মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখতে পাওয়া যায়, এই ধরণের টুকরো কাপড়ে নানা রকমের নক্সা ছুঁচ দিয়ে তৈরী করবার (Embroidery) রেওয়াজও অনেক দেশেই প্রচলিত। কিন্তু এই সব সৌখিন নক্সাদার কাপড় আর কাঁথা এক পর্যায়ের জিনিষ নয়। ব্যবহারের দিক থেকে

কোন কোন বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এই দুই ধরণের জিনিষের উদ্ভব এবং ব্যবহারের মূলে যে অনুপ্রেরণা দেখা যায়, তা নিতান্তই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য শুধু ব্যবহারিক দিকের বৈশিষ্ট্যেই সীমাবদ্ধ নয়, উপকরণ নির্বাচন, নির্মাণ-পদ্ধতি এবং নক্‌শাগুলিতে নিহিত ইঙ্গিতের তাৎপর্যেও এই স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। কাঁথার উপকরণ পরিত্যক্ত পুরোনো ছেঁড়া কাপড়; সেলাইয়ের জন্য যে সুতোর ব্যবহার করা হয় তাও সংগ্রহ করা হয় পুরোনো কাপড়েরই পাড় থেকে। সুঁইয়ের ফোঁড়ে নক্‌শা-রচনার (Embroidery) দিকে খেয়াল সর্বত্রই বর্তমান থাকলেও পৃথিবীর অন্যত্র কোন জাতের মধ্যেই এই ধরণের নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী পুরোনো ছেঁড়া নেকড়া কাঁথার মত উল্লেখযোগ্য শিল্প ব্যাপারে ব্যবহার হতে দেখা যায় না। জমি আর নক্‌শা রচনার দিক থেকেও কাঁথার বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। সমস্ত জমিটা জুড়ে কাপড়ের করো গুলোকে সমান করে সাজিয়ে টানা সুঁইয়ের ফোঁড় খুব ঘন করে সোজা আর আড়াআড়ি করে দিয়ে চৌকো চৌকো একটার ভেতরে আর একটা ক্রমে ছোট হয়ে যাওয়া খোপ কেটে কাঁথাগুলি সেলাই করা হত। এই ছিল কাঁথা তৈরীর প্রাথমিক পর্যায়। প্রথমবারের এই সেলাইতে কাঁথার নেকড়াগুলি ছেঁড়া পুরোনো অবহেলিত আকৃতি বিসর্জন দিয়ে খাপি সূতোয় বোনা আনকোরা কাপড়ের মতই একটা সৌন্দর্য ও প্রীতি মণ্ডিত হয়ে উঠত। এরপর সুনির্বাচিত রঙিন সূতোয় ফুটিয়ে তোলা হত নক্‌শার সমারোহ। কাঁথার জমি যেমন সেলাইয়ের গুণে জমাট হয়ে তাতে বোনা কাপড়ের মত দোরোখা আর জমাট হয়ে উঠত, নক্‌শাগুলিও তেমনি ভরাট ফোঁড়ের গুণে কাঁথার দু'দিকে ফুটিয়ে তুলত এক অপূর্ব বৈচিত্র্য। কাশ্মিরী শালের কাজে আর চম্বার রুমালে দু'দিকে নক্‌শার এই সমান বৈচিত্র্য দেখা গেলেও অন্য কোন ছুঁচের কাজে এই ধরণের দোরোখা সেলাই বড় একটা দেখা যায় না। সূতোর রঙ নির্বাচনেও বেশ কিছু আভিজাত্য আছে। মোটামুটি কালো, লাল আর হলদে এই তিন রঙের সূতোর ব্যবহারই ছিল

বেশী। এ ছাড়া সবুজ, খয়ের, গোলাপী এই ধরণের আরও কয়েকটা রঙের সূতোরও ব্যবহার হত। ছুঁচের দোরোখা জমাট ফোঁড়ে যেমন পূর্ণতার ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় নক্শায় ব্যবহার করা সূতোর রঙেরও তেমনি অর্থপূর্ণ তাৎপর্যের সন্ধান আছে বলে মনে হয়। সূতোর প্রধান তিনটি রঙ হলদে, লাল আর কালো সৃষ্টির সত্ত্ব-রজ-তম এই গুণত্রয়েরই প্রতীক। জমি এবং সূতোর এই ইঙ্গিতময়তা আরও বিস্তৃতি লাভ করে কাঁথার গায়ের সংখ্যাহীন নক্শাগুলিতে। এই সব নক্শার পরিকল্পনা ও বিন্যাস কোন দু'টি কাঁথায় এক রকম না হলেও এই নক্শাগুলির মূলে একটা ঐক্য এবং সন্নিবদ্ধতা (system) সহজেই চোখে পড়ে। কাঁথার গায় ফোটানো এই সব নক্শাগুলি কাঁথার ব্যবহারিক দিকটাকে অনুল্লেখযোগ্য করে এর ইঙ্গিতময়তার দিকটাকেই বড় করে তোলে। কাঁথার বৈশিষ্ট্য সাধারণ সুচী-শিল্প থেকে কাঁথা-শিল্পকে একটু কৌলিন্য সম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

আজকাল কোন কোন শিল্পকেন্দ্রে উৎসাহী মহিলারা নূতন করে কাঁথা-শিল্পের প্রবর্তন করবার প্রয়াস করে থাকলেও পুরোনো চলিত ধরণের কাঁথার সেলাই আর ব্যবহার এক রকম উঠে গিয়েছে বলেই চলে। যে সামাজিক পরিবেশ, যে অসীম ধৈর্য, শিল্প ব্যাপারে যে অশিক্ষিত পটুতা এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি যে অপরিসীম দরদ এই শিল্পের মাধ্যমে সজীব ছিল এখন আর তার কিছুরই অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অবস্থার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরোয়া ধরণের আরও অনেক চলিত শিল্পেরই মত—কাঁথার নির্মাণ ও ব্যবহার যদি আজ উঠে গিয়ে থাকে, তাতে হয়ত দুঃখ করবার কিছু নেই। তবে নিজেদের ভাল করে চিন্‌তে হলে পূর্বপুরুষদের গুণ ও কর্মের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয় এবং এই সূত্রেই—কাঁথা-শিল্পের আলোচনার সার্থকতা আছে মনে হয়। বর্তমানে যেসব কাঁথা শিল্প-প্রাণ ব্যক্তিদের সংগ্রহে বা সাধারণ সংগ্রহশালাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়, তার সংখ্যা খুব বেশী নয় আর তার কোনটি শ'খানেক

বছর থেকে বেশী পুরোনো নয়। অধিকাংশ কাঁথাই ২৫।৫০ বছরের মধ্যেই তৈরী। বোধ হয় বাংলার সর্বত্রই কাঁথা সেলাইয়ের প্রচলন ছিল। তবে পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনার কাঁথাই বেশী প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদ বা রাজসাহী, ত্রিপুরা থেকেও কাঁথার সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্য অঞ্চলের কাঁথার সংগ্রহ বড় একটা দেখা যায় না। মেয়েরা সমস্ত গৃহ কর্মের মধ্যে অবসর সময়ে এই কাঁথা সেলাই ক'রতেন কখনও কখনও একজনের পক্ষে একখানা কাঁথা সেলাই করে শেষ করা সম্ভব হ'ত না ; পর পর কয়েকজন মিলে কাঁথাটিকে শেষ করতেন। সেলাইয়ের আর নক্শার মূল সূত্রগুলি এমনি করেই পরম্পরাগত হ'য়ে বাংলার নারী সমাজে চিরদিনকার সম্পত্তিতে পরিণত হ'য়ে গিয়েছিল। বাংলার নারী সমাজ এমনি ক'রে আত্মগত করে থাকলেও ঐতিহ্যের দিক্ থেকে কাঁথাতে অনেক পুরোনো দিনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ব'লে মনে হয়। কাঁথার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে। উপনিষদের যুগেই মানুষের জ্ঞানের সীমা খুব বিস্তার লাভ ক'রেছিল এবং সেই যুগ থেকেই ভাব প্রকাশের জন্য ভাষায় ইঙ্গিত এসে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। এই ইঙ্গিত প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় দ্ব্যর্থবোধক কথায় এবং শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে এবং উপমায়। শিল্পের জগতে এই ইঙ্গিত প্রবণতা আরও আগেই আত্ম প্রকাশ ক'রেছিল ; মানুষ যখন সভ্যতার পথে বেশীদূর অগ্রসর হয়নি তখন তারা নানাবিধ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করতে ; এই সব শক্তির কোনটিকে মনে করা হত মঙ্গলের আধার, আবার অন্য কতগুলিকে সকল অমঙ্গলের কারণ এই বিশ্বাসে ভয় করা হত। প্রত্যক্ষভাবে এই গুলির নাম ও অনেক সময় উচ্চারণ করা হত না ; শিল্পেও এই সব জিনিষের প্রত্যক্ষ চেহারার পরিবর্তে ইঙ্গিতময় অনুরূপ গুণ বিশিষ্ট অন্য কোন জিনিষের ছবির ব্যবহার হত। সাংস্কৃতিক পরিশীলনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ছবি

এবং ইঙ্গিত মার্জিত এবং উন্নত স্তরের প্রকাশ ভঙ্গীর বাহনরূপে ব্যবহৃত হ'তে লাগল। ঐতিহাসিক যুগে সমাজ এবং ধর্ম সংস্কারক মহাপুরুষেরা প্রায় সকলেই ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় উপদেশ প্রচার করে দ্ব্যর্থবোধক ভাষা এবং ইঙ্গিতকে এক নূতন মহিমা দান করেন। বহু-প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহারিক এবং চারুশিল্পে ইঙ্গিত একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে বসে। সকল দেশের শিল্পেই সংস্কার এবং ধর্মগত অনেক ইঙ্গিত motif বা চিত্রালঙ্করণের রূপে বিস্তৃতভাবে ব্যবহার হ'য়ে আসছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিল্পের সকল অঙ্গে এবং সকল প্রকাশ ভঙ্গীতে ইঙ্গিতের এবং রূপকের যে গভীরতা এবং দ্যোতনা দেখা যায়, তার তুলনা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। এই ইঙ্গিতময় প্রকাশের পরিচয় বুদ্ধের জীবন এবং বাণীতে খুবই ব্যাপক। ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যেরা যে পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, সেই পরিচ্ছদ তৈরী হত লোক-পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের সমষ্টি থেকে। নূতনই জীর্ণ হয় আর যাঁদের জ্ঞান উন্মেষিত হয়েছে তাঁদের কাছে নূতন এবং জীর্ণের কিছু পার্থক্য থাকে না। বুদ্ধ এবং বুদ্ধ শিষ্যদের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধানের মধ্যে এই পরম জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস দেখা যায়। মনে হয়, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের এই ইঙ্গিতময়ত্ব সম্বন্ধে ধারণা বুদ্ধ ভগবানের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। উপনিষদে তাঁতে-বোনা বস্ত্রখণ্ডের টানা-পোড়েনের উপমার উল্লেখ আছে। দরিদ্র এবং সাধু সমাজে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের এই ব্যবহার থেকে মনে হয়, বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে সেলাই করা জীর্ণ বস্ত্রে তৈরী কাঁথার ব্যবহার চলছে। কিন্তু কাঁথার গায়ে বিচিত্র নক্‌শা খচিত করার রেওয়াজ কবে থেকে প্রচলিত হয়, তা ঠিক ক'রে বলা যায় না। বিচিত্র নক্‌শায় সজ্জিত বস্ত্রখণ্ডের উল্লেখ সাহিত্যে ইতস্ততঃ পাওয়া গেলেও এই ধরণের বস্ত্রখণ্ডের এখন আর কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না।

উপকরণের এই ইঙ্গিতপূর্ণতা থেকেও কাঁথার গায়ের নানা নক্‌শার বৈশিষ্ট্য আরও বিস্তৃত, অর্থপূর্ণ এবং ব্যাপক। ব্যবহারের বিভিন্নতার

সূত্রে কাঁথাগুলির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিভিন্ন মাপের হ'ত। অধিকাংশ কাঁথাই তৈরী হ'ত সাধারণ আচ্ছাদন এবং আবরণের জন্য। দেহাবরণের জন্য তৈরী কাঁথা প্রায়ই দৈর্ঘ্যে চার-পাঁচ হাত হত, আর প্রস্থে তিন চার হাত মাপের। অন্যদিকে আর্শী চিরুণী মুড়ে রাখবার জন্য তৈরী কাঁথা হত একহাতটাক লম্বা আর বিঘত খানেক চওড়া। এর মাঝামাঝি মাপের কাঁথা হ'ত তোরঙ্গ-প্যাঁট্‌রা ঢেকে রাখবার বা অন্যান্য নানা রকমের কাজের জন্য। আয়তনের তারতম্যের মত খচিত নক্‌শার বিন্যাসেও কাঁথাগুলিতে তারতম্য ঘটত। মাঝারি আর বড় ধরণের কাঁথাগুলির অলঙ্কারের কেন্দ্র ছিল একটা বড় পদ্ম; পদ্মের চারিদিকে অনেকগুলি পাঁপড়ি; সুপূর্ণ প্রস্ফুটিত অষ্টদল, শতদল বা সহস্রদল পদ্ম। এই পদ্মের নক্‌শা সকল অলঙ্কারের কেন্দ্র রূপে প্রায় সব কাঁথারই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাঝখানকার এই পদ্মের মত প্রত্যেক কাঁথার চারদিকে চারটি বন্ধনী (Border) দেখা যায়। এই সব লক্ষণ থেকে কাঁথাগুলিকে একটা সুসম্বদ্ধ চিত্র পটের মতই মনে হয়। এই বন্ধনীর মধ্যে মাঝের পদ্ম ফুলের চারদিকে অসংখ্য ছোট-বড় নক্‌শা, কোথাও সাজানো ডোরে কোথাও নিতান্ত অগোছাল ভাবে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু সমগ্র ভাবে দেখালে এই অগোছাল ভাবে তোলা নক্‌শাগুলিতে কোনও অসামঞ্জস্য দেখা যায় না, বরং রঙ বা রেখা বিন্যাস এমন ভাবেই চোখকে আকর্ষণ করে যে, মনে হয় এই অবিন্যস্ত নক্‌শাগুলিও যেন একটা সুষ্ঠুভাবে সাজান ছকেরই অন্তর্গত। আবার মোটামুটিভাবে দেখলে নক্‌শা গুলিতে যেমন একটা ভাবের ঐক্য রয়েছে এগুলিকে সাজাবার মধ্যেও একটা সুসংবদ্ধতা আছে তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। সব নক্‌শাই কেন্দ্রের পদ্মফুলকে অবলম্বন ক'রে পদ্মের দিকে গতিশীল ক'রে তোলা। আবার এই নক্‌শাগুলিকে পদ্মের চারদিকে যেমন একের পর এক সাজানো ব'লে মনে হয়, তেমনি এই সারিগুলির মধ্যে মানুষের পারিপার্শ্বিক জগতের প্রয়োজনের ও অপ্রয়োজনের এমন জিনিষ কিছু নেই যার সঙ্গে পরিচয় না হয়। বস্তু-সমারোহের

এই নাটকীয় সমাবেশের মধ্যে মানুষ নিজেই হচ্ছে সর্ব প্রধান চরিত্র। নানা অবস্থায় নানা ভঙ্গীতে নর-নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশে কাঁথাগুলির পট পরিপূর্ণ। কোথাও এরা প্রচলিত কোন আখ্যায়িকার অতি পরিচিত পাত্র-পাত্রী; অন্যত্র বিচিত্র ভঙ্গীতে এবং বিচিত্র বেশভূষায় যাঁরা এই কাঁথার দে অলঙ্কৃত ক'রে আছে তাঁদেরও খুবই চিনি-চিনি ব'লে মনে হয়; যাঁরা এদের নক্সায় তুলে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে এদের নিকট সম্বন্ধ ছিল; তাঁদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এদের যোগ ছিল অতি নিকট। মানুষের পরেই আসে প্রতিবেশী জীবজন্তু, বৃক্ষলতার সামগ্রিক পরিবেশ; জীবজন্তুর মধ্যে বন্য এবং গৃহপালিত ভেদে পরিচিত পশু-পক্ষীর প্রায় কিছুই বাদ যায় না। জীব জন্তু বৃক্ষ লতার প্রতি ভারতীয় মনের যে অপরিসীম দরদ ভারতীয় শিল্পের পশু ও বৃক্ষ লতা রূপকে এত বিচিত্র এবং সুসমৃদ্ধ ক'রে রেখেছে এই কাঁথা গুলিতে পশু-পক্ষীর বৃক্ষ লতার এই বিচিত্র সমাবেশে সেই দরদেরই ছাপ। সুস্পষ্ট আকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য হাতীর উপর ভারতবাসীর যেন একটা সহজাত আকর্ষণ রয়েছে; হাতীর রূপ ও আকৃতির যে বৈশিষ্ট্য ভারতীয়দের কাছে ধরা পড়েছে এমনটা আর কোন জাতির মানুষের কাছে পড়েনি। ভারত শিল্পের সর্বত্রই প্রায় হাতী যে স্থান অধিকার করে আছে, কাঁথাগুলিতেও তার বৈলক্ষণ দেখা যায় না। রকমারী ভঙ্গীর অনেক হাতী এই নক্‌শাগুলিতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। এর পরই উল্লেখ করা যেতে পারে ঘোড়ার কথা; তুলকি-তালে চলা, বাঁকানো-ঘাড় ঘোড়াগুলিও এই নক্‌শায় কম সুন্দর আকৃতি গ্রহণ করেনি। আর আছে বাঁদব, মাছ, সাপ আর কুকুর।

গাছপালার মধ্যে কদম গাছের বাহুল্যটা সহজেই চোখে পড়ে; বাংলার গ্রাম অঞ্চলে ঘন বর্ষায় নব মঞ্জরিত বহু ফুলে সমৃদ্ধ কদম্ব বৃক্ষ যে দেখেছে, কদম্বের উপর বাঙালী মনের এই আকর্ষণের কারণ তার কাছে আর ব্যাখ্যা করে দিতে হয় না। এ ছাড়া কৃষ্ণ-জীবন লীলার সঙ্গে কদম্বের যোগাযোগও এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

এছাড়া নানা পরিচিত ও কাল্পনিক ফুল, পাতা এবং গাছের সমাবেশও কাঁথাগুলিতে কম নেই।

পশু এবং বৃক্ষ লতার জগৎ ছাড়া আর যে সব বস্তুর সমাবেশ কাঁথার নক্শায় দেখা যায়, সেগুলি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি—গাড়ী, পাল্কী, নৌকো ইত্যাদি যানবাহন, হাঁড়ি-সরা, কুনকে-গাড়ু, ধামা-ধুনী, থালা-বাসন ইত্যাদি তৈজস-পত্র, আর্শী-চিরুণী, শাড়ী-গয়না, সিঁদূরের কৌটো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদি অলঙ্কারও ঐশ্বর্য্যের সামগ্রী।

নক্শাগুলির এই বৈচিত্র্য ও তার বিন্যাসের মধ্যে কল্পনার বিস্তৃতি এবং সজীবতা ছাড়া ইঙ্গিত পূর্ণতার যে একটা দিক আছে, তাও কিছু কম নয়। এই দিক থেকে কাঁথার নক্শাগুলির সঙ্গে বাংলার অতি প্রচলিত আলপনার নক্শাগুলির যে যোগাযোগ রয়েছে তা যে কোন সন্ধানী ব্যক্তিরই দৃষ্টি অতিক্রম করে যেতে পারে না। আল্পনার নক্শাতেও সব অলঙ্কারের কেন্দ্র হচ্ছে একটি বৃহৎ ও বহু দলে প্রস্ফুটিত পদ্ম। ঐ পদ্মকে অবলম্বন করে চারদিকে নানা রকমের নক্শা। কাঁথার নক্শাতে যেমন, আল্পনার নক্শা আঁকাতেও সাধারণ মেয়েদের শিল্পি-মনের অশিক্ষিত পটুত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু নক্শার ঐশ্বর্যই নয় উপকরণের দিক থেকেও কাঁথার সঙ্গে আল্পনার বেশ যোগাযোগ রয়েছে। আল্পনার নক্শা আঁকা হয় মাটির উপর—যা কাঁথার ছেঁড়া নেকড়া থেকেও সুলভ এবং শাশ্বত। এই অঙ্কণের উপকরণ একমাত্র পিটুলিগোলা—পাড়ের সূতো থেকেও বাঙ্গালীর ঘরে সহজলভ্য। আল্পনায় মূল রঙ্ হচ্ছে সাদা ; এই সাদা রঙ্ ত্রিগুণাতীত সার্বভৌমত্বের প্রতীক—কোথাও রঙিন আল্পনারও প্রচলন দেখা যায়—কিন্তু পিটুলিগোলার শ্বেতশুভ্র আল্পনারই প্রচলন বেশী। অবশ্য আঁকার অনতিকাল পরেই আল্পনার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়। মূল্যহীন উপকরণে তৈরী কাঁথার স্থায়িত্ব আর প্রয়োজনান্তে আল্পনার ধ্বংসের মধ্যেও যেন একটা অলক্ষিত যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়।

আলপনার ব্যবহার হয় গৃহস্থের ঘরে নানা ব্রত ও পূজার উপকরণ হিসাবে। পুরাণ-বিহিত নানা দেব-দেবীর পূজাতে আল-পনার ব্যবহার থাকলেও এই ধরণের পূজার সঙ্গে একমাত্র মাঙ্গলিক চিহ্ন ছাড়া আলপনার আর কোন প্রত্যক্ষ প্রয়োগ বা ব্যবহারিকতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে অপ্রত্যক্ষ যোগ যে আছে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নাই। আলপনার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ও ব্যবহার দেখা যায় কুমারী এবং সধবা মেয়েদের অনুষ্ঠিত নানারকম ব্রতে। এক সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে এই কুমারী ও সধবাদের অনুষ্ঠিত ব্রতের প্রচলন ছিল; বার এবং ঋতু-ভেদে সম্বৎসরই প্রায় ব্রতের অনুষ্ঠান হত। এতগুলির নামও ছিল ভারি সুন্দর। সাঁজসেজুতী ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, অশত্থপাতা ব্রত, ষষ্ঠি ব্রত ইত্যাদি ব্রতগুলি এখন তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে থাকলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালী গৃহস্থের প্রতি ঘরে-ঘরে বিশেষ যত্ন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এইসব ব্রত অনুষ্ঠিত হত। গভীর বিশ্বাস এবং ত্রুটিহীন নিপুণতার সঙ্গে মেয়েরা ব্রতের যোগাড় করতেন; আগেকার দিনে উপবাস করা, স্নান ও প্রক্ষালনের দ্বারা পবিত্র হয়ে ভোগ ও নৈবেদ্য রচনা করা—মাটিতে আলপনা দেওয়া এবং সর্বশেষে প্রচলিত 'কথা' আবৃত্তি করাই ছিল ব্রতের বিভিন্ন অঙ্গ। গৃহ ও সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-ভ্রাতা, স্বামী-পরিজনের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি কামনাই ছিল এইসব ব্রত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ব্রতগুলির বহু ইঙ্গিত আজকের দিনে অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলেও এগুলির ব্যবহারের দিকে আলপনার নক্‌শাগুলির স্থান সম্বন্ধে বিশেষ অবোধ্য কিছু নাই। এগুলিকে নানা রকমের কামনা পরিপূর্তির উপায় বলে বিশ্বাস করা হত। এইসব আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ফলবতী করবার উপায় হিসেবে আলপনার নক্সাগুলিকে ব্যবহার করা হত। কথাগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রত প্রচলিত হওয়ার কাল্পনিক কাহিনীটি বিবৃত হলেও ব্রতের ভেতর দিয়ে অভীপ্সিত কাম্য বস্তুর ছবিটি এই আলপনার মধ্যে পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে পাওয়া যায়। যে উৎস থেকে এইসব কাম্য বস্তুর অধিকার

আসবে সেই উৎসটির ইঙ্গিতময় নক্‌শা দিয়ে আলপনার আরম্ভ ; ঐটি হচ্ছে আলপনার কেন্দ্রস্থ বহু দলে বিকশিত পদ্ম। পদ্মের জন্ম পঙ্কে, এর নাল থাকে জলের মধ্যে, আর ফুল সব অতিক্রম করে শূন্যে সূর্যের উদয়ের সঙ্গে তার মৃণালগুলি উন্মুক্ত করে আর সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে গুটিয়ে নেয়। পদ্মের এইসব লক্ষণের সঙ্গে মানুষের পরিকল্পিত নানা গূঢ় তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখে শিল্পে ও সাহিত্যে তার বহু ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রায় সকল জাতির মানুষের কল্পনায়ই সূর্যকে সকল গতি ও প্রাণের কারণ বলে উপলব্ধি করে নানাভাবে সূর্যকে পূজা ও পরিতোষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উপলক্ষে সূর্যের মূর্তি এবং নানাবিধ প্রতীকরূপের উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে। ভারতবর্ষীয় ইঙ্গিত-কল্পনায় পদ্মফুল সূর্যের প্রতীকরূপে বহুদিন থেকেই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সূর্যই সকল কামনা সকল অভীপ্সা পূরণের একমাত্র শক্তি বা কারক। কাঁথা এবং আলপনার নক্‌শায় যে পদ্ম দেখা যায় এই পদ্মই আছে বিষ্ণু আর সূর্যমূর্তির হাতে অয়ুধরূপে এবং শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন প্রকরণে। জগৎ-মণ্ডলের প্রতীকরূপে পদ্ম ছাড়া কোথাও কোথাও সূর্যকে আকাশে জ্যোতির্ময় বৃক্ষের আকারেও কল্পনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষই বিভিন্ন জাতির কল্প বৃক্ষরূপে পূজা লাভ করেছে—ভারতবর্ষীয় কল্পনায় বৃক্ষমাত্রই কল্পবৃক্ষের ছায়া। কদম্ব বৃক্ষ অনেকক্ষেত্রে এই কল্প বৃক্ষেরই বিকল্পরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কাঁথার কেন্দ্রস্থিত পদ্ম এবং বৃক্ষগুলির রূপায়ণে এই ইঙ্গিতেরই প্রকাশ রয়েছে। পদ্মের চারদিকে থাকে শঙ্খলতা ; এই শঙ্খলতা শুভ্রতা এবং পবিত্রতার প্রতীক।

পদ্ম এবং শঙ্খলতার বাইরে বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নক্‌শার সমাবেশ করা হয়। কোনটাতে হাতী, ঘোড়া, কাঁকুই, আর্শী, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, পায়ের ছাপ ; কোনটাতে নৌকা, পাল্কী ; কোনটাতে চন্দ্র, সূর্য, ধানের শীষ পূর্ণকুম্ভ, অলঙ্কার। ব্রত অবলম্বনকারী কুমারী এবং সধবা নারীরা যে সব আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের কামনায় এইসব

ব্রত অনুষ্ঠান করতেন, আলপনার নক্শায় সেই সব দ্রব্যেরই রূপ; এ ছাড়া নক্শাগুলি পূর্ণতা, প্রাচুর্য, পবিত্রতা ইত্যাদি কাম্য গুণের নির্দেশক।

কাঁথার নক্শাগুলির সঙ্গে আলপনার নক্শাগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও এই উভয় ধরণের নক্শাগুলির মধ্যে একটা বিশেষ নৈকট্য রয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আলপনার নক্শার মত কাঁথাতেও হাতী, ঘোড়া, কাঁকুই, আর্শী, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, নৌকা, পাল্কী, চন্দ্র, সূর্য, ধানের শীষ, অলঙ্কার, নিত্য ব্যবহারের জিনিষ, বাড়ী-ঘর, বাক্স-প্যাঁটরা ইত্যাদি দেখা যায়। এ ছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের নানা দৃশ্যও এ কাঁথাগুলিতে থাকে।

কাঁথাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাঁরা সেলাই করতেন তাঁরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য তৈরী করতেন না, আত্মীয় ও তাঁদের অতি আপনার প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার জন্যই এগুলি তৈরী হত। অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমে তৈরী কাঁথাগুলির নক্শার সৌন্দর্যই কিন্তু এই উপহারের প্রধান উপজীব্য ছিল না। এই নক্শাগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত মানস-কামনা এবং ফললাভের আশীর্বাদই ছিল এই উপহারের প্রধান লক্ষ। নক্শাগুলি ঠিকভাবে আঁকা হলে তাতেই ঈপ্সিত ফললাভ হবে এই বিশ্বাস নিয়েই ধৈর্য, সংযম এবং পবিত্রতার সঙ্গে ব্রত পালন করা হয়। কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে ও এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়। তারপর আসে উপহারের পালা। এ যেন যজ্ঞফল দান করারই অন্য এক উদাহরণ। উপহার দানের সঙ্গে যেন এই কামনাই করা হল—'আমার সকল নিষ্ঠা সর্ববিধ সংযম এবং সুদীর্ঘ পরিশ্রমে যদি কোন ফল হয়—যদি এই কাঁথায় অঙ্কিত কোন একটী ঈপ্সিত দ্রব্য এই নিষ্ঠা ও সংযমের ফলে আমার প্রাপ্য হয়ে থাকে তবে আমাকে না হয়ে তা তোমাতে বর্তাক—সে ফলে আমার কোন স্পৃহা নাই; আমি সম্পূর্ণভাবেই আমার লভ্য সকল ফলই তোমাকে অর্পণ করলাম।' কাঁথা-শিল্পের এইদিকটি সামাজিক ও মনন-কল্পনার দিক থেকে সত্যই তুলনাহীন।

যে আদিম প্রকৃতি মানুষকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন এবং চিন্তা-কল্পনায় প্রবুদ্ধ করেছিল, তার মধ্যে মানুষের আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সম্বন্ধে সচেতনার মূল নিহিত রয়েছে। বর্তমানের মানুষ সভ্যতার গরিমায় এই সচেতনতাকে অস্বীকার করতে চাইলেও মানুষের সকল উন্নতির মূলে যে জ্ঞান তার অন্বেষণে আদিম অবস্থায় এই আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সম্বন্ধে চিন্তাই তাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, এ কথা অস্বীকার করবার পথ নাই। আদিম কাল থেকে শক্তিই হচ্ছে মানুষের একমাত্র কাম্য ; এই শক্তির সাহায্যেই সে তার নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় ; এই শক্তির সহায়তায়ই সে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যা-কিছু সংগ্রহ এবং উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়। জীবনের অস্তিত্ব এবং সব কিছু ভোগের মূলেই হচ্ছে এই শক্তি। এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু করায়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত শক্তির অন্বেষণই মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে বিবর্দ্ধন করেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ আজ অকল্পনীয় শক্তির অধিকারী হয়েছে : কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের অধিগত শক্তি জাগতিক শক্তির তুলনায় আজও কত নগণ্য। এই শক্তির উৎস জড় না চেতন এই সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই এবং বিজ্ঞানের এই প্রগতির যুগেও তা অজ্ঞেয়ই রয়ে গিয়েছে। এক সময় ছিল, যখন মানুষের অধিগত শক্তি ছিল তার শৈশব অবস্থায়—কিন্তু শক্তি লাভের কামনা কিছু কম ছিল না। প্রকৃতির মধ্যে শক্তির যে অফুরন্ত উৎস রয়েছে, এ বিষয়ে তাদের সচেতনতা ছিল—অজ্ঞাতভাবে সেই শক্তির কোন কোন আইনকে নিজের প্রয়োজনে তারা ব্যবহারও করেছিল। পাথর দিয়ে অস্ত্র নির্মাণ, তীর-ধনুকের মূল সূত্র আবিষ্কার ইত্যাদির মধ্যে এ শক্তিতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না ; তাদের প্রধান সমস্যা কি করে শত্রু নিপাত করা যায়। সে যুগ ছিল মানুষের জীবন-মরণ সমস্যার যুগ। শুধু নখ-দন্তে সজ্জিত মানুষের দেহ অসংখ্য জন্তুতে অধ্যুষিত পৃথিবীতে কোন বিষয়েই প্রতিবেশীদের থেকে বেঁচে থাকার পক্ষে বেশী উপযোগী ছিল না। সেই ভীষণ প্রতিযোগিতার মধ্যে

প্রতিদ্বন্দ্বীকে উৎখাত করার মধ্যেই ছিল বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায়। এবং বেঁচে থাকবার জন্য এই ভয়াবহ সংগ্রামে তাদের নিজের বুদ্ধি এবং বাহুবলই ছিল একমাত্র প্রত্যক্ষ সহায়। তারা এই নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে এই নিয়েই তারা সেই ভীষণ সংগ্রামে সফলকাম হয়ে থাকলেও তারা নিজেরা কিন্তু কখনও কেবলমাত্র নিজেদের শক্তির উপরে নির্ভর করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। কোন একটা অপরিজ্ঞাত শক্তির উপরে নির্ভরশীলতা সেই আদিমতম কালেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায় ইচ্ছার অভিব্যক্তির মধ্যে। ভীষণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম! সংগ্রামে হাতিয়ার ছুঁড়ে-মারা বল্লম, গাছের ডাল, পাথরের টুকরো। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আবাস-গুহার প্রাচীরে আঁকা হল সেই শত্রুর ছবি জীবিতাবস্থায়, সংগ্রামরত অবস্থায় এবং সর্বশেষে মানুষের হাতে মরণাহত অবস্থায়। মানুষের প্রবল ইচ্ছা শত্রু নিপাতিত হোক, এই প্রবল ইচ্ছারই রূপ দেখি এই ছবিগুলিতে; এবং তারা এই বিশ্বাসই পোষণ করত যে, এই ধরণের চিত্র অঙ্কনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অলক্ষিত কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিতভাবেই তাদের শক্তিকে সাহায্য করবে, যাতে করে তারা ঠিক অমনিভাবেই শত্রুকে নিপাতিত করতে পারবে। এই প্রক্রিয়াকেই ইংরাজিতে বলা হয় magic। এই magic-এর মূলে কোন যুক্তি নাই। তবে বিচার করে দেখলে দেখা যায়, magic মানুষের ইচ্ছাশক্তিরই প্রকাশিত রূপ—যার মধ্যে রয়েছে সেই অজ্ঞেয় শক্তির সচেতন প্রকাশ।

যে আদিম বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে এই magic-এ, সেই বিশ্বাস থেকেই পরবর্তী যুগে ব্রত-পার্বণ পূজা-প্রার্থনার প্রবর্তন হয়। যাগ-যজ্ঞ পূজা-প্রার্থনার নানা আঙ্গিকের মতই ব্রতের আলপনার মূলে সেই আদিম মানুষের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আলপনায় সাজান নানা নক্‌শায় বিহিত দ্রব্য-সামগ্রী পৃথিবীতে লভ্য এবং আমার কাম্য। আমি এই কাম্য লাভ করতে চাই। এই কাম্য লাভের

জন্য প্রয়াসও করা হবে। তবে আমার বিশ্বাস, আমার শক্তি গৌণ—যদি যথাযথভাবে ব্রত অনুষ্ঠান করা যায় তবে অতি সহজেই এই সকল কাম্য আমার অধিগত হবে।

অতি প্রাকৃতের উপর এই বিশ্বাস থেকেই ব্রত-পার্বণ, পূজা-প্রার্থনার সূত্রপাত হয়েছিল। যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি পূজা-প্রার্থনার নানা আঙ্গিক এই বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি। অথর্ব বেদের নানা ক্রিয়াকলাপ এবং তন্ত্রশাস্ত্র এবং পুরাণ-বিহিত নানা বর্ণ, আকৃতি এবং বেশভূষায় কল্পিত বিবিধ দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার মূলেও ঐ কামনা পরিপূরণের প্রয়াসই সুস্পষ্ট।

ক্রমশ প্রকৃতির উপর আধিপত্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত ভাবে মানুষ আজ অনেকটা এই অতিপ্রাকৃতের উপর বিশ্বাসকে অতিক্রম করে উঠে থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে অতিশয় অগ্রসর সভ্যদেশের মানুষেরও এই ধরণের অতিপ্রাকৃতের উপর আস্থা রয়েছে। বর্তমানের মত বিজ্ঞানলব্ধ আলোক যখন মানুষের লভ্য ছিল না, তখন সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এই অতি-প্রাকৃতের উপর বিশ্বাস নানাভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। সূর্যই পৃথিবীর সকল শক্তির মূল আধার; এই বিশ্বাস থেকে প্রায় সকল সমাজেই অল্প-বিস্তর সূর্য-পূজার প্রচলন হয়েছিল। সূর্যের পরেই মানুষ নির্ভর করেছে অন্ন-প্রসূ পৃথিবীর প্রজনন শক্তির উপর। পৃথিবীর এই প্রজনন-শক্তিই মানুষকেও সন্তান-প্রজননের অধিকারী করেছে। এই প্রজনন-শক্তির অধিষ্ঠাত্রীকে নারীরূপিণী কল্পনায় বহু সমাজে নানাভাবে পূজা ও তোষণের ব্যবস্থা করা হত। সকল কামনা-বাসনার পরিপূরকরূপে wish tree বা কল্পবৃক্ষ এবং পূর্ণ-কুম্ভের পরিকল্পনাও পৃথিবীর সকল সমাজেই বর্তমান। আধিভৌতিক শক্তির উপর এই আস্থা পৃথিবীর সকল জাতির মানুষেরই পুরুষানুক্রমে রক্ষিত সম্পদ। বিভিন্ন সমাজের মানুষ বিভিন্নভাবে এই সম্পদকে রক্ষা করেছে, রূপদান করেছে এবং উপভোগ করেছে।

আদিম জাতিগুলির মধ্যে নানা রকমের দৈবী কল্পনার উদ্দেশ্যে ভোজ্যপেয় সঙ্গীত নৃত্য উপহারের প্রচলন দেখা যায়। এইসব সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী সরল; ভয় গভীর হলেও খুব বেশী জিনিষ সম্বন্ধে এই ভয় প্রসারিত নয়। এদের বিশ্বাসও তাই সরল, পূজা-প্রণালী অনাড়ম্বর।

বেদের যুগে মানুষ ছিল জীবনের ভোগ-সুখ সম্বন্ধে সচেতন, স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে নির্মম ও সংগ্রামশীল; তাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবন সেই যুগেই যথেষ্ট জটিল হয়ে পড়েছিল। তাহলেও ব্যবহারে তারা ছিল প্রত্যক্ষবাদী। ভোগ্য দ্রব্যের উপর অধিকার বিস্তারের জন্য তারা নিজের বাহুবল এবং কর্মশক্তির উপর নির্ভর করত। এই বাহুবলকে পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী করবার জন্য যজ্ঞের মাধ্যমে তারা ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্য, নাসত্য ইত্যাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভোজ্য ও পেয় উৎসর্গ করত। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম মনের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর থেকে একদিকে যেমন মোহমুক্তি ঘটেছিল, অন্যদিকে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং আদিম সমাজের নানাবিধ বিশ্বাস একসঙ্গে যুক্ত হয়ে পরবর্ত্তী যুগে মার্জিত ধরণের দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার মধ্যে যে সমাজের ছবি প্রতিফলিত হয় সেই সমাজের গঠন এবং সেই সমাজবর্তী মানুষের পেশা এবং এরা যে সব জিনিষ ভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা করত তা হয়ে দাঁড়াল অত্যন্ত বিস্তৃত এবং জটিল। সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা রাজ্য শাসন করত; যুদ্ধ-বিগ্রহে ছিল তাদের পরম উৎসাহ; জগতের সকল রকমের ধনরত্ন, বিত্ত-বিভাগের দিকে ছিল তাদের দুর্দান্ত আকর্ষণ। বণিক শ্রেণীরা সেই সমাজের বিলাস-ব্যসনের যোগান দিয়ে নিজেরা প্রভূত বিত্তের অধিকারী হত। এদের ধন-ঐশ্বর্য, রূপ-যৌবন, শক্তি সামর্থ লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্খারই ছবি দেখা যায় এই যুগের উদ্ভাবিত নানা রকমের প্রতিমার ধ্যান এবং পূজার উপকরণে। সমাজের উচ্চ স্তরে যে সময় নানা ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেব-দেবীর পূজার প্রচলন হতে থাকে সেই যুগেই সমাজের সাধারণ স্তরে বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্যে

এক অদ্ভূত মানস-কল্পনা রূপ গ্রহণ করেছিল। এই মানস-কল্পনারই ছবি পাওয়া যায় তাঁদের বার-ব্রত এবং পূজো-আর্চায়। পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা সারা ভারতের মিলিত সংস্কৃতির যৌথ সম্পত্তি হলেও এই ধরণের ব্রত-অর্চনা মনে হয় বাংলার নিজস্ব। এইসব ব্রত-পার্বণের মধ্যে বাংলার বৈশিষ্ট অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের নিজস্ব, তার প্রায় সব কিছুই বাংলার সমাজ আত্মস্থ করে নিয়েছিল এবং তারই সঙ্গে নিজের বৈশিষ্ট্য যোগ করে এক অপূর্ব এবং বিচিত্র মানস-লোকের সৃষ্টি করেছিল। রূপৈশ্বর্যে এবং প্রসাদগুণে এই ভাব কল্পনার কোন তুলনা পাওয়া যায় না।

ব্রতগুলির উপলক্ষ এবং উদ্দেশ্য নানাবিধ এবং বিচিত্র। লক্ষ্মীব্রতে প্রাচুর্য ও ধনৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে তুষ্ট করবার জন্য ব্রতের আয়োজন ; এই লক্ষ্মীকেই দেখা যায় বিষ্ণুর অন্যতমা শক্তিরূপে ; এরই মূর্তি সুপ্রাচীন শিল্পে গজলক্ষ্মীরূপে বিবৃত হয়েছে ; ভারহুতের বৌদ্ধস্তূপের পাথরে তৈরী রেলিং-এ শ্রীমা দেবতারূপে যে মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে, তাও হয়ত লক্ষ্মীমূর্তি। শ্রী ও পুষ্টির অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীকে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকলেও মুখ্যতঃ ইনি ছিলেন সাধারণের প্রাকৃতজনের পূজিত নানা গ্রাম দেবতারই অন্যতমা। সংস্কৃত ধ্যান ও মন্ত্রের দৌলতে একদিকে ইনি উচ্চতর সমাজে গৃহীত হলেও সাধারন লোকের মধ্যে পুরোহিত প্রভাবহীন লক্ষ্মীর জনপ্রিয়তা এই ব্রতের মধ্যে সেদিন পর্যন্তও অপ্রতিহত ছিল। লক্ষ্মীব্রত ছাড়া আর যে সব ব্রত খুব জনপ্রিয় হয়ে ছিল, তার মধ্যে তোষলা ব্রত শস্যপ্রসূ বসুন্ধরার উদ্দেশ্যে, ভাদুলী আর বসুধারা ব্রত বর্ষণ দেবতার উদ্দেশ্যে, মাঘমণ্ডল ব্রত সূর্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হত। এইসব ব্রতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোন স্থান ছিল না। মেয়েরা নিজেরাই ছিল ব্রতের উদ্যোক্তা আর ব্রতের প্রচলিত 'কথা' আবৃত্তি করে (বা পড়ে) তারাই অনুষ্ঠান শেষ করত। এই কথাগুলির মধ্যে বিচিত্র সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন

ব্রতের কথা থেকে বোঝা যায়, যে যুগে এই ব্রতগুলি প্রচলিত হয়ে ছিল সে যুগে বাংলার অধিবাসীরা দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে যেত। দূর দেশে সম্ভাব্য সকল বিপদ-আপদ থেকে যাতে প্রবাসী আত্মীয়-পরিজনেরা মুক্ত থাকে, যাত্রা হয় শুভ, উপার্জ্জন হয় অফুরন্ত, তারই কামনায় ব্রত পালন করা হত। কোন ব্রতে (ভাদুলী ব্রত) কামনা করা হত গোয়াল ভরা গরুর, বংশোজ্জ্বলকারী পুত্রের, শ্রীমতী কন্যার; কপাল ভরা সিঁদূর, সাগর তীরে মৃত্যু, সুখ-শান্তিতে পূর্ণ সংসার এবং নিজের পুত্রকন্যা, স্বামী-পরিজন সকলের জন্য মঙ্গলই ছিল তাঁদের কাম্য।

এই সব ব্রত কথায় সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে সমাজ ছিল শান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন; উচ্চভিলাষীরা বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রচুর ধন-রত্ন ঘরে আনতেন; এইসূত্রে দূর দূর দেশে ছিল তাদের গতায়াত; গৃহগত জীবনে নারী সমাজ সুখ-ঐশ্বর্যের ধ্যান করত; আত্মীয় পরিজনের মঙ্গল কামনা করত; কামনা করত ধনে-জনে সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ সংসার; জ্ঞান ও কল্পনা ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু দৃশ্যমান ও কল্পনার জগৎ দুয়েরই একটা সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে চাইত; এই জগৎ-সংসারের প্রতি কিন্তু তাদের সহানুভূতি এবং দরদ ছিল অপরিসীম। পিতা-মাতা, শ্বশুর, পরিজন সকলের সুখ-শান্তি এবং মঙ্গল কামনার ভেতর বাংলার নারী সমাজ যে মানসিক সংস্কৃতি রচনা করেছিল, ব্রত, আলপনা আর কাঁথাগুলিতে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায়।

কাঁথাগুলির মধ্যে আলপনার বা ব্রতের পরিচিত আশা-আকাঙ্খার রূপটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে যুগের নারী সমাজের কল্প-জগতের সকল আকাঙ্খার সামগ্রীই এই কাঁথায় রূপায়িত দেখা যায়। জীবনে সমগ্র ভাবে লাভ করাই ছিল এই সব আকাঙ্খার মূল। জীবনের সকল প্রাচুর্য এবং আকাঙ্খার উৎস অদৃশ্য জীবন শক্তির প্রতীক পদ্মকে কেন্দ্র করে কাম্য হল ঐশ্বর্য্যের। সঙ্গে সঙ্গে উপদেশাত্মক আখ্যান বস্তুর সমাবেশে কাঁথার নক্শাগুলি পরিপূর্ণ।

যে সব প্রবীণ মহিলা কাঁথায় এই নক্‌শাগুলি তুলতেন, রঙ্‌ ও রেখার সুষমা এবং বৈচিত্র্য ছাড়া নক্‌শার ইঙ্গিতপূর্ণতা সম্বন্ধেও তাঁদের সচেতনতা ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্নেহ এবং প্রীতির পাত্র—যাঁদের উপহার দেওয়ার জন্য এই কাঁথাগুলি তৈরী হত তাঁদের মঙ্গল কামনায় যে গভীর নিষ্ঠা এই কাঁথাগুলিতে পাওয়া যায়, তার তুলনা আছে বলে মনে হয় না। বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে সব সামগ্রীতে বাংলার সংস্কৃতির ছাপ ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, কাঁথা-শিল্প সেগুলির অগ্রগণ্য। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের পটভূমিতে বিপুল ঐশ্বর্যের পরিকল্পনা ভোগ-সুখের অচিরস্থায়িতারই দ্যোতক। কাঁথা প্রস্তুত করা ও উপহার দেওয়ার মধ্যে একদিকে বাংলার স্নেহপরায়ণ মনের পারস্পরিক সম্পর্কের ঐতিহ্যের সঙ্গে পার্থিব জগতের সকল ঐশ্বর্যের মৌলিক অচিরস্থায়িতার ইঙ্গিতের যোগাযোগটি বাঙ্গালী মনের এক উল্লেখনীয় সৃষ্টি। চলিত শিল্পের জগতে কাঁথার স্থান সত্যই তুলনা হীন।

সাড়ী ও নক্‌শা

কাঁথা বা আলপনার সগোত্র না হলেও নক্‌শার পারিপাট্যে এবং বোনার কৌশলে বাংলার তাঁতের সাড়ী আজও যে তার জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পেরেছে দীর্ঘদিনের পরিশীলিত অভিজ্ঞতাই রয়েছে তার মূলে। কার্পাস বস্ত্রের জন্য নদীবিধৌত বাংলার আর্দ্র বাতাস নাকি বিশেষ উপযোগী; অনেকে মনে করেন বাংলাই কার্পাসের জন্ম-স্থান। তাঁতের টানা আর পড়েনের ব্যবহার যে ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কার্পাস বস্ত্র কোনদিনই বাংলার মত ঔৎকর্ষলাভ করে নাই। মহেঞ্জোদরোর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এক টুকরো কার্পাস বস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই কার্পাস বস্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। এই দেশ থেকে

সুদূর অতীতে মিশরে এবং খ্রীস্ট জন্মের অব্যবহিত পরে রোমে কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী হত। অকুণ্ঠভাবে বিদেশীরা ভারতের কার্পাস বস্ত্রের সূক্ষ্মতা এবং বয়ন কৌশলের প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী যুগে বাংলার কার্পাস বস্ত্র মুঘল দরবারে অতিশয় আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। সে যুগে ঢাকার তাঁতীরা য মসলিন বস্ত্র বুনত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে। সাত পর্দা মসলিনে দেহ আবৃত করে পিতার সন্নিধানে আসায় ঔরংজেব তাঁর কন্যা জেব উন্নেসাকে শালীনতা হীনতার জন্য তিরস্কার করেছিলেন এ কথা ঢাকার তাঁতীর কৃতিত্বের প্রমাণ হিসাবে ইতিহাসের পাতায় বিধৃত হয়ে আছে। প্রভাতে ঘাসের ওপর ফেলে রাখলে শিশিরে ভিজে মসলিন এমন ভাবে ঘাসের সঙ্গে মিলিয়ে যেত যে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি হত না। অনুরাগীরা আদর করে এই সব কাপড়কে কত সুন্দর সুন্দর নামই না দিয়েছিল ; পার্শী কথায় 'সব্‌নম্' বা ভোরের শিশির ঢাকার মসলিনের এমনি একটি নাম। মসলিনে নানা রকমের বুটি তুলে তৈরী করা হত রকমারী নক্‌শার সাড়ী যাকে বলা হত জামদানী। জামদানী সাড়ীর সূতা খুব সরু, বুনট অত্যন্ত জমাট ; কিন্তু এই সাড়ীর বিশেষত্ব তার নক্‌শায় আর বুটিতে। জামদানী নক্‌শাগুলি মূলত রেখা ভিত্তিক ; কোথাও জ্যামিতিক, কোথাও গাছ বা লতা পাতাকে সংক্ষিপ্ত আর বাহুল্যহীন করে সাজিয়ে নেওয়া হত। নক্‌শাগুলির বনিয়াদে তার বর্ণবিন্যাসে এবং হলদে লাল আর সবুজ এই তিনটি বর্ণের প্রাধান্যে কাঁথার নক্‌শার সঙ্গে এই সাড়ীর একটা নিকট ঐক্য দেখা যায়। পাড়ে আর আঁচলে এই সব নক্‌শায় ফুটে ওঠে এক অপূর্ব শ্রী। ঢাকার এই বুটিদার আঁচলাওয়ালা কাপড় বাংলার তাঁত শিল্পের এক বিশিষ্ট কৃতিত্বের নিদর্শন। কার্পাস বস্ত্রের বিশিষ্টতার জন্য বাংলার আরও অনেক অঞ্চলের খ্যাতি আছে। এর মধ্যে টাঙ্গাইল, বিষ্ণুপুর, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, ধনেখালীর নাম সর্বজন পরিচিত। এই সব সাড়ীতে পাড় আর আঁচলে কিছু কিছু রঙ আর নক্‌শা থাকলেও

লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে এগুলিকে তেমন বিশিষ্ট বলে বলা যায় না।

ষোল আনা লোকশিল্প বলে গণ্য করা না গেলেও নক্‌শা আর রঙের বৈচিত্র্যে মুর্শিদাবাদ বালুচরে তৈরী নাম করা রেশমের সাড়ীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারা যায় না। এই সাড়ীর পাড়ে সাধারণ নক্‌শা আর জমিতে নানা আকৃতির বুটি থাকে। কিন্তু এই সাড়ীর বৈশিষ্ট্য তার আঁচলার নক্‌শায়। এই আঁচলার বিন্যাস চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মত ; এই ক্ষেত্রের মাঝখানে থাকে সুন্দর গড়নের কল্কা ; তার চারদিকে খোপে খোপে সাজান থাকে নানা বিচিত্র নক্‌শা ; হাতী, ঘোড়া, শোয়ার, তাম্রকুট সেবন রত রমণী ও পুরুষ, পাল্‌কী, এমন কি রেলগাড়ী এবং জাহাজ। মন্দিরের প্রাচীরে টালির গায় খোদাই করা যে ধরণের দরবারী ছবি দেখা যায় মুসলমান আমলের শেষ অবস্থার সেই আড়ম্বর পূর্ণ সমাজের তেমনি বিচিত্র আলেখ্য এই সাড়ীর আঁচলগুলিকেও শোভিত করে আছে। অননুকরণীয় কৌশলে তাঁতীরা অসংখ্য রঙের সূতার হিসাব রেখে এই সব নক্‌শা বুনত ; আজকের উন্নত পর্যায়ের কলের তাঁত এ ধরণের নক্‌শা বা তার জমাট মাধুর্য কোন মতেই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নাই। নবাব, বিত্তশালী জমিদার ইত্যাদি সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের জন্যই প্রধানত এই সাড়ী তৈরী হত ; এই সাড়ীর নকৃশায় তাদের রুচি, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট হলেও যে হাত এই তাঁত বুনত তা ছিল সাধারণ গ্রামীণ কারু শিল্পীর। বয়ন শিল্পে আজও বোধ হয় এদের জুড়ী কোথাও হয় নাই ভবিষ্যতে ও হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

পুতুল

রূপের অনুশীলনে ছবি আগে কি মূর্তি আগে তা নিয়ে তর্কের অবসান হয়নি। দৈর্ঘে প্রস্থে সীমায়িত গণ্ডীর মধ্যে আঁকা ছবি কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে মূর্তির মত ব্যাপকতা লাভ করতে পারে নি। বর্ণালী ঢং ছবিকে দেয় সরসতা; অবয়বের জমাট পূর্ণতায় মূর্তির মহিমা। মূর্তি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর গড়নের ডৌলেই পূর্ণ নয়; স্পর্শ করে তার ঘনত্ব অনুভব করা যায়। রূপ এখানে নিতান্ত দৃষ্টির বিভ্রম নয়, অনুভূতিকে যাচাই করে নেওয়া যায় তার অস্তিত্বের নিঃসংশয়তায়।

ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিকেই সাধারণতঃ বলা হয় পুতুল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমাজেই পুতুলের ব্যবহার দেখা যায়; তবে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের ব্যবহারের ক্ষেত্র; উপকরণ, নির্মাণ কৌশল এবং তৈরী পুতুলের আকৃতি আর সংবেদনে অনেক রকমের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এই পরিবর্তনের ঢেউ কিন্তু আমাদের সমাজে এসে পৌঁছুতে দেরী হয়নি; গেল পনের কুড়ি বছরের মধ্যে পুতুলের আকৃতি প্রকৃতি এবং ব্যবহার অনেকটাই বদলে গিয়েছে। পুতুলের আবির্ভাব আর তার ক্রম বিবর্তনের কাহিনী বেশ কৌতূহলজনক।

ক্ষুদ্রায়তন মূর্তি কে কোথায় প্রথম সৃষ্টি করেছিল এবং কোন প্রেরণায় তা নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। শিল্পতত্ত্বানুরাগী অপেক্ষা নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরাই বোধ হয় এ সম্পর্কে শেষ কথা বলবার অধিকারী। শিল্পের উদ্ভব ও বিবর্তনে মানুষের মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানীদেরও কিছু নিজস্ব মত আছে।

মানুষের অনুকরণ স্পৃহা, ইঙ্গিত প্রবণতা এবং যাদুক্রিয়ায় বিশ্বাস থেকেই সম্ভবত পুতুলের উদ্ভব হয়েছিল। সুপ্রাচীন যুগের গুহামানবেরা বাসগুহার প্রাচীরে যেসব ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে

মানুষের চিত্রাঙ্কন প্রয়াসের সেইগুলিই সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন। এইসব ছবিতে সে যুগের নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দেখা যায়। এইসব জানোয়ার ছিল সে যুগের মানুষের প্রবলতম শত্রু। বর্ণের প্রলেপে উজ্জ্বল, অত্যন্ত সজীব এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আঁকা এই ছবিগুলিতে রেখা আর রঙের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় থাকলেও এগুলিকে নিছক শিল্প প্রেরণার নিদর্শন বলে মনে করা যায় না। সেই আদিম যুগের মানুষের আদৌ কোন স্বতস্ফূর্ত শিল্প প্রেরণা ছিল বলে অনুমান করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই মনে হয় অন্য কোন প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা ঐসব ছবি এঁকেছিল।

আদিম জাতির জনগণের মধ্যে এখনও এমন অনেক বদ্ধমূল সংস্কার আছে যার প্রভাব সভ্য সমাজে থাকলেও সেগুলিকে কুসংস্কার বলেই অভিহিত করা হয়। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এই ধরণের সংস্কারগুলির অন্যতম। সাধারণ চোখে যা দেখা যায় না এমন অনেক শক্তি পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু বৃক্ষলতা এমন কি জড় পদার্থকেও নিয়ন্ত্রিত করে। অনেকে এই সমস্ত শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে নানাভাবে নিজের ইচ্ছাকেও কার্যকরি করতে পারে।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় তাকে বলা চলতে পারে যাদুক্রিয়া (Magic)। কোন শত্রুর ছবি আয়ত্বাধীনে থাকলে সেই শত্রুর অনিষ্ট করবার ক্ষমতা হ্রাস পায়; সেই শত্রুর ছবির উপর বিশিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা আঘাত বা ক্ষতি সাধন করলে উদ্দিষ্ট শত্রুর অনুরূপ আঘাত প্রাপ্তি বা ক্ষতি সাধিত হতে পারে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সেই প্রাচীন গুহা মানবেরা নাকি পর্বত বা গুহা প্রাচীরের গায় ছবি এঁকেছিল। সেই সুপ্রাচীন যুগের কোন মূর্তি এখনও কোথাও থেকে পাওয়া যায়নি, তবে মানুষ আর পশুপক্ষীর মূর্তিও যে খুব প্রাচীন কালেই অনুরূপ কারণেই আত্মপ্রকাশ করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রেরণা থেকেই টোটেম সম্পর্কিত বিশ্বাসেরও উদ্ভব হয়। অনিষ্টকারী শত্রুর ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করে তার উপর যাদুক্রিয়া

দ্বারা শত্রুর অনিষ্ট সাধন করা সম্ভবপর হয় এই বিশ্বাস থেকে যেমন অনিষ্টকারী পশুর মূর্তি নির্মাণের প্রেরণা এসেছিল তেমনি এই ধরণের পশুকে নিষ্ক্রিয় করে রাখবার জন্যও হয়ত তার ছবি বা মূর্তির সঙ্গে রাখবার বা তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার প্রেরণা উদ্ভূত হয়েছিল। এমনি করে টাটেমের মূর্তি গড়ার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়। এইসঙ্গে পরম রহস্যময় প্রজনন শক্তির প্রতি বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকেই জননী-মূর্তির উদ্ভব হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। প্রজনন কার্যে নারীর অংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রধান; এই সূত্রেই নারী-শক্তিতে দেবত্ব আরোপ এবং মাতৃকা-পূজার প্রবর্তন হয়। মানবী ছাড়াও এই প্রজনন ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন পশু বা সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পশু বা সরীসৃপ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। এই সমস্ত পশু বা সরীসৃপের মূর্তি থেকেই দৈবী-মূর্তির প্রবর্তন সূচিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সেই সুপ্রাচীন যুগে প্রবর্তিত যাদুক্রিয়া উপলক্ষ্যে নির্মিত মূর্তি থেকে ক্রমে দেবদেবীর মূর্তির উদ্ভবের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দৈবী-প্রতিমা পর্যন্ত অগ্রসর না হয়ে যেখানে এই সমস্ত মূর্তি আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ব্যবহারে অন্যতর বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে রইল, পুতুল তার অন্যতম।

হয়ত সেই সুপ্রাচীন কালেই যাদুক্রিয়ার প্রয়োজনে তৈরী পুতুল মানব শিশুর হাতে পড়েছিল; হয়ত যে মানুষ প্রথম পুতুল গড়ছিল সেই তুলে দিয়েছিল ঐ পুতুল তার সন্তানের হাতে; সেই শিশুও পেয়েছিল ঐ পুতুলে তার মনের অনেক খোরাক। যে জন্তুটিকে দূর থেকে দেখে তার মনে ভয় আর বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছে, যাকে নিয়ে তার মনে অনেক আলোড়ন, নিদ্রায় যার আকৃতি স্বপ্ন হয়ে তাকে ছুঁয়ে যায়, তারই আকৃতি হাতে পেয়ে শিশুর কল্পনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল; সেই পুতুলকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার

নিজের জগৎ। বনের পশুকে ভয় করলেও পুতুলের পশু হল তার করায়ত্ত ; ঘরের মানুষ তার দূরে চলে গেলেও পুতুলের মানুষ নিতান্ত তারই ইচ্ছার বাহন। এই পুতুল নিয়ে স্বভাবতই গড়ে তুলেছিল শিশুরা তাদের নিজেদের একটি বিশিষ্ট পরিমণ্ডল। যে পরিমণ্ডলে সে সর্বশক্তিমান, পুতুল-পশু, পুতুল-মানুষ তারই আজ্ঞাবহ। সম্পূর্ণ তারই ইচ্ছাধীন। ক্রমে বহু পশু মানুষের কৌশলে ধরা পড়ে পোষ-মানা পশুতে পরিণত হল, হল মানুষের আজ্ঞাবহ; তার কেনাবেচার সামগ্রী। এদিকে অলঙ্কারে পোষাকে নিজেকেও মানুষ সাজিয়ে তুলল সম্পূর্ণ নূতনভাবে। ক্রমে পুতুলের জগতেও পরিবর্তন দেখা দিল: আদিম পশু আদিম নরনারীর পরিবর্তে ক্রমে গৃহপালিত পশু আর মার্জিততর মানুষের মূর্তি আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু গৃহপালিত হলেও কোন কোন পশুর প্রাচীন টোটেম বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হল না; নানা দেবদেবীর বাহনরূপে তাদের অনেকগুলিই যেমন টিঁকে রইল প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে, তেমনি শিশুচিত্তেও তাদের স্থান রইল অটুট হয়ে। অন্যদিকে সমাজে বিবর্তন ঘটল নানা বৈচিত্র্যময় বিবর্তন ঘটল। বিশেষ করে ভারতবর্ষে রূপবৈচিত্র্য কেবলমাত্র যে স্বীকৃতি লাভ করল তাই নয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের আকার নিল। সেইজন্যই দেখি একই গৃহে একজন হয়ত ঘোর বৈদান্তিক, অন্য জন পুরাণবিহিত মূর্তি পূজায় উৎসাহী; আবার গৃহ-রমণীরা প্রাচীন যাদুক্রিয়া থেকে একটুখানি মার্জিত ব্রত আচার নিয়ে ব্যস্ত। এই বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সমাজে পুতুলের বিভিন্ন রূপ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একই ধরণের পুতুলকে দেখি খেলার সামগ্রী হিসাবে শিশুদের হাতে; আবার সেই ধরণের পুতুলই কিন্তু বারব্রত উপলক্ষ্যে পুররমণীদের হাতে মর্যাদা নিয়ে দাঁড়ায় ব্রতবিহিত নানা পাত্র-পাত্রীর আকারে। আবার এই পুতুলেরই বৃহদায়তন পরিমার্জিত রূপ দেখা দিল উচ্চ স্তরের প্রতিমায়। পুতুল তাই মানুষের এক অপরূপ সৃষ্টি; মানুষের সংস্কৃতিগত বিবর্তনের এবং মানুষের মনন কল্পনার ভাবসমৃদ্ধ আলেখ্য।

বাংলাদেশের পুতুলের ধরণ-ধারণ এবং তৈরী করবার পদ্ধতিতে এমন অনেক বৈচিত্র্য আছে যা নজর করে দেখবার মত। বিষয়-বৈচিত্র্যেও পুতুলগুলি কম যায় না। শরীরের জমাট গড়ন, নানা রঙের প্রলেপের উজ্জ্বলতা, মুখ, চোখ, হাত, পা, কাপড় পরবার ধরণ, বসবার, দাঁড়াবার, ছেলে-কোলে করবার বিচিত্র ভঙ্গী পুতুলগুলিকে কত বৈচিত্র্যেই না সমৃদ্ধ করে রেখেছে। কল্পনার বিচিত্রতায়, ভঙ্গীর অজস্রতায়, অভিব্যক্তির সংক্ষেপণে এবং ব্যঞ্জনা'র সরসতায় বাংলাদেশের পুতুলগুলি যেন সত্যই তুলনাহীন।

পুতুল নির্মাণের উপকরণ প্রধানত মাটি। অবশ্য মাটি ছাড়া আর কোন উপকরণ যে পুতুল গড়তে ব্যবহার হয়, না তা নয়। কাঠের তৈরী পুতুলের প্রচলন মাটির পুতুলের মত না হলেও বেশ জনপ্রিয়। ধাতুর পুতুল, স্যাকড়ার পুতুল, শোলার পুতুল, কাগজের পুতুল এমন কি পিটুলীর পুতুল, সরের পুতুল, গোবরের পুতুলের প্রচলনও বাংলাদেশে দেখা যায়। মাটির পুতুলের ব্যবহার প্রধানত দেখা যায় শিশুদের খেলার সামগ্রীরূপে। কিন্তু ছোটদের খেলার পুতুল ছাড়া ঐ একই ধরণের পুতুলের ব্যবহার আছে নানা ধরণের বারব্রত উপলক্ষ্যে। মেয়েলীব্রত উপলক্ষ্যে ননীর পুতুল, পিটুলীর পুতুলেরও ব্যবহার আছে। মাটির পুতুলের চলনও ব্রতে দেখা যায়। বিশেষ করে ষষ্ঠীর ব্রতে মাটির তৈরী ষষ্ঠী ঠাকুর। লক্ষ্মীব্রত আর মনসা ব্রত উপলক্ষ্যে চিত্রিত সরা বা ঘট তৈরী করবার রেওয়াজ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। অন্যান্য কোন কোন ব্রতেও পুতুলের প্রয়োজন হত। ব্রত ছাড়া পুতুল, বিশেষ করে হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি গ্রাম বাংলার অতি পরিচিত ষষ্ঠীতলা মাদারের হাট বা পীরের সমাধির উপর রেখে যাওয়ার প্রচলনও এখানে আছে। পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রামের অতি পরিচিত কোন গাছের তলায় অজস্র হাতী, ঘোড়া আর ছেলে-কোলে করা মা পুতুলের সমাবেশ দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

আজ আর বাংলার গ্রামের হাটে, মেলায় কিম্বা তীর্থক্ষেত্রে

প্রথাগত পুতুলের সেই সমাবেশ দেখা যায় না। কলিকাতার অনতিদূরে কৃষ্ণনগরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এক বিশিষ্ট ধরণের পুতুলের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার আর দশ জায়গার পুতুল থেকে এর রূপ-রস ছিল স্বতন্ত্র। নিপুণ ও নিখুঁত স্বাভাবিকতা ছিল এই পুতুলের বৈশিষ্ট্য। জমিদার, মোসাহেব, পাইক, বরকন্দাজ, ময়ূরপঙ্খী নৌকো, কাটা ছাগলের মুণ্ডু, মাছ, পাখী, আম, জাম, সুপুরীর কুচি এত বাস্তব, এত নিখুঁত পোষাকে-পরিচ্ছদে মুখের গড়নে আর ভঙ্গীতে রঙে আর আকৃতিতে, যে অনেক সময় আসল থেকে নকল চিনে নেওয়া কঠিন হত। এই পুতুলের চাহিদা কি করে হল, অনুপ্রেরণা এল কোথা থেকে তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এইসব পুতুলেরই কিছুদিন আগুপিছু মুর্শিদাবাদে হাতীর দাঁতে তৈরী ঐ ধরনের নানা খেলনারও প্রচলন হয়েছিল। এইসব উপকরণের চাহিদা ছিল নবাব পরিবারের অন্দর মহলে এবং তাদেরই অনুকরণে এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করত নবাব দরবারের পরিষদেরা। সেই ধারাকে অনুসরণ করেই যে এই স্বভাবানুগামী বা বাস্তব-ধর্মী শিল্পের প্রবর্তন হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই পুতুল সহজেই বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বহু ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ঐ ধরণের কৃষ্ণনগরের পুতুল ভারতবর্ষের পরিচয় হিসাবে স্বদেশে নিয়ে যেত। এইসব পুতুলের নিখুঁত নকল-নবিশীয়ানায় যে কৌশল, যে পারঙ্গমতা ছিল প্রচলিত ধারার ভারত শিল্পের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত ধারার পুতুলের তুলনায় এই বাস্তবধর্মী পুতুলের বাজারে চাহিদা থাকলেও সাংস্কৃতিক মূল্য খুব বেশী কিছু ছিল না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, প্রবহমানতার বৈশিষ্ট্যে প্রথাগত পুতুল অতুলনীয়; এই জাতের পুতুলের গঠনের বৈশিষ্ট্যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসে, অলঙ্কার ও পরিধেয়ের পারিপাট্যে যুগাতীত জনমানসের পরিচয় প্রতিলিখিত ছিল। এরা প্রাচীন যুগ থেকে বয়ে

আনছিল সেই বিস্মৃত কালের এক অজানা ধূপের সৌরভ, এক না দেখা জগতের স্বপ্ন।

পুতুলের, বিশেষ করে মাটির পুতুলের বিস্তৃত প্রচলন কোন কোন দেশের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলেই গণ্য হয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর থেকে পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অনেক জায়গায় মাটিতে গড়া পুতুলের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। এইসব জায়গা কিছু পরস্পরের কাছাকাছি নয়; এদের মধ্যে খুব যে যাতায়াত ছিল যাতে করে এক অঞ্চলের প্রভাবে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে একই ধরণের জিনিষের আদান-প্রদান চলত তাও বলা যায় না। সেইজন্যই অনুমান হয় যে স্বতন্ত্র হলেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মানুষ স্বভাবের প্রেরণাতে একই ধরণের পুতুল তৈরী করতে ব্রতী হয়েছিল। এইসব পুতুলের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য কিন্তু খুবই বিস্ময়কর। অত্যন্ত সহজে এই মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল; যার জন্য নির্মাতাকে কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করতে হয়েছিল বলে মনে হয় না। অভীষ্ট পশু বা মানুষের সঙ্গে এই সব পুতুলের আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য শিল্পীর যে বিশেষ কোন মাথা ব্যথা ছিল তা মনে হয় না। অত্যন্ত সংক্ষেপে মাথা, হাত, পা আর শরীর তৈরী করেই শিল্পী সন্তুষ্ট; মুখ, চোখ, নাক আর ঠোঁট এবং শরীরে সামান্য কিছু অলঙ্কারের আদল এলেই হল। মূর্তিগুলির মধ্যে নারী-মূর্তির সংখ্যা ছিল বেশী; এইসব নারী-মূর্তির ক্ষেত্রে প্রজনন ক্ষমতার লক্ষণগুলি বিশিষ্ট করে দেখান হত। পুতুলের মধ্যে পশুমূর্তির টোটেম সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য এবং নারীমূর্তির মাতৃত্ব লক্ষণ থেকে এই অনুমানই করা হয় যে সেই প্রাচীনতম পর্যায়ের পুতুলের ক্ষেত্রে শিল্পচাতুর্য অপেক্ষা নানাপ্রকারের বিশ্বাসে পরিপুষ্ট ইঙ্গিত প্রবণতাই ছিল প্রধান।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পর্যায়ের পুতুলের ক্ষেত্রেও মোটামুটি এই একই সিদ্ধান্তই নেওয়া যেতে পারে। উত্তর পশ্চিমে পাঞ্জাব,

বেলুচিস্থান এবং সিন্ধুর হরপ্পা, কুল্লি, ঝোব, এবং মহেঞ্জোদরো ইত্যাদি অঞ্চল থেকে যে অসংখ্য মাটিতে তৈরী পুতুল পাওয়া গিয়েছে বৈচিত্র্যে এবং বৈশিষ্ট্যে সেগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য হলেও খুব বেশী নূতনত্ব এগুলির মধ্যে নেই। এইসব পুতুলের মধ্যে যে সব পশুর অনুকৃতি পাওয়া যায় ডৌল বা গঠন সৌকর্যের দিক থেকে সেগুলি সমসাময়িক আমলের মোহরাঙ্কিত পাটা বা Seal-এর উপরে খচিত পশুমূর্তির মত সুগঠিত না হলেও অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের দিক থেকে বোধ হয় একই পর্যায়ের। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি মোহরাঙ্কিত পাটা ; এই পাটার উপরে খচিত একটি দৃশ্যে দেখা যায় এক ব্যক্তি একটি দণ্ডের উপর একটি পশুমূর্তি নিয়ে চলেছে ; তার পেছনে চলেছে একদল অনুগামী। হয়ত এটি একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রার ছবি যেখানে দৈবী ইঙ্গিত সমৃদ্ধ পশুমূর্তিটি ছিল প্রাচীন টোটেম থেকে উদ্ভূত কোন দৈবীশক্তির প্রতীক। প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির প্রায় সবগুলির ক্ষেত্রেই এই ধরণের দেবতার প্রতীকরূপে পশুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল। মিশরের স্ফিনিক্স্ বা এপিস ষাঁড়, ক্রিটের মিনটার নামীয় ষাঁড়, গ্রীক্‌দের এ্যাপলো বা হেলিয়সের ঘোড়ার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদে নানা দেবতার প্রসঙ্গেও এই ধরণের পবিত্র পশুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্রের বৃষ, সূর্যের অশ্ব, বিষ্ণুর গরুত্মন (গরুড়) ইত্যাদি সেই সেই দেবতার প্রতীকরূপে বৈদিক সমাজে মর্য্যাদালাভ করেছিল।

হরপ্পা সভ্যতার মানুষ ও পশুর আকৃতির পুতুলের সঙ্গে খুব প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও পরবর্তী যুগের মাটির পুতুল যে ভারতের সুপ্রাচীন যুগের সংস্কৃতির ধারা থেকে রস আহরণ করেই পুষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের পলিমাটিতে গড়া সমতল ভূমিতে কবে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল, কবে সভ্যতার পদসঞ্চার হয়েছিল তা এখনও স্থির

করে বলা চলে না। কিন্তু পাটলিপুত্রে মৌর্য রাজাদের আবির্ভাবের যথেষ্ট আগে থেকেই যে এই গঙ্গা বিধৌত সমভূমিতে সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল, গড়ে উঠেছিল অনেক বড় বড় সহর এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে। প্রাচীন তাম্র-লিপ্তির স্মৃতি বিজড়িত তমলুক থেকে আবিষ্কৃত কয়েকটি মাটির পাত্র, বেড়াচাঁপায় পাওয়া মোহরাঙ্কিত মাটির চক্রাকার পাটা, হরিনারায়ণপুরের কয়েকটা জিনিষ থেকে এই অনুমান আজ দৃঢ় হচ্ছে যে বাংলার তথাকথিত পলিমৃত্তিক সভ্যতা হয়ত নিতান্তই অর্বাচীন নয়।

অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলায়ও মাটির পুতুল সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে গড়ে উঠেছিল। বেড়াচাঁপা, তমলুক বা হরিনারায়ণপুরের আবিষ্কৃত অসংখ্য পুরাবস্তুর মধ্যে মাটির তৈরী মূর্তি এবং পুতুলের সংখ্যা খুবই ব্যাপক। নির্মাণ কৌশল এবং বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই পুতুলগুলিকে বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা চলে। এর মধ্যে অনেক পুতুল আঙ্গুল দিয়ে তৈরী। এইগুলির মাথা চ্যাপ্টা, নাক পাখীর ঠোঁটের মত। হাতে বা পায়ে কনুই হাঁটু বা আঙ্গুল দেখাবার কোন চেষ্টা এই সব পুতুলে দেখা যায় না। এগুলির চোখ আর গয়না আলাদা করে মাটির দলা বা লেত্তি দিয়ে তৈরী। পোড়াবার ফলে কোন কোনটি একটু কালচে বাকিগুলি ফিকে বাদামী। রঙের বালাই এসব পুতুলে ছিল না; কোন কোনটার গায় একটা হাল্কা ধরণের প্রলেপ লাগান হত পোড়াবার আগে, যার ফলে পোড়াবার পরে এগুলির গায় একটা জেল্লা দেখা দিত।

আঙ্গুল দিয়ে তৈরী করা পুতুলের পর উল্লেখ করা যেতে পারে ছাঁচে গড়া পুতুলের কথা। মৌর্য রাজাদের রাজত্বের কিছু কাল পরেই ছাঁচে গড়া পুতুলের প্রচলন হয়েছিল; প্রাচীন আমলের সহর বন্দরের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক ছাঁচে গড়া পুতুলও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ থেকে যে সব ছাঁচে গড়া পুতুল

আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে তার মধ্যে আনুমানিক শুঙ্গ আমলের তৈরী, বাঁকুড়া জেলার পোখরনা (প্রাচীন পুষ্করণা) থেকে পাওয়া একটি সুন্দর নারী মূর্তিই সবচেয়ে পুরোনো। এই পুতুলটি লম্বায় পাঁচ ইঞ্চির মত, চওড়ায় আড়াই ইঞ্চি; কানে কর্ণপূর, গলায় একাবলী, সরু কোমর বেড়ে আঁটোকরে পরা ধূতির ভাঁজ ঘাগরার মত করে ছড়িয়ে ডান হাতে ধরা, বাঁ হাতে সযত্নে ধরা একটি শুকপাখী; দাঁড়াবার লাস্যময়ী ভঙ্গী থেকে এই মূর্তিটিকে দেবীমূর্তি অপেক্ষা কোন যক্ষিণী বা নায়িকা মূর্তি বলেই অনুমান হয়। দিনাজপুর জেলায় বানগড়, মেদিনীপুরের তমলুক, ২৪পরগনার চন্দ্রকেতুগড় থেকে আশুতোষ সংগ্রহালয়ের প্রত্নতত্ত্বসন্ধানীরা অনেক রকমের পুরোনো পুতুল সংগ্রহ করেছেন। এইসব পুতুলের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অতীত যুগের এক ভুলে যাওয়া সভ্যতা, এক স্বপ্নময় জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব পুতুলের মধ্যে হাতে গড়া মূর্তিও আছে; তবে অধিকাংশই ছাঁচে গড়া। এর মধ্যে কতগুলি নানারকমের জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি; জন্তু-জানোয়ারগুলির মধ্যে হাতী, ভেড়া, ছাগল, ষাঁড়ই বেশী। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের একটি দৃশ্যে শকুন্তলার শিশু পুত্র সর্বদমনের একটি মাটিতে গড়া ময়ূর নিয়ে খেলা করবার বর্ণনা পাওয়া যায়। মাটিতে গড়া পশুমূর্তিগুলি মনে হয় শিশুদের ক্রীড়াসামগ্রী হিসাবেই ব্যবহার হ্ত। তবে বাচ্ছাদের খেলনা ছাড়া এর অন্য ব্যবহার যে ছিল না একথা মনে করার কোন কারণ নেই। উত্তর সৈন্ধব সভ্যতার যুগথেকেই পশুমূর্তির দৈবী ইঙ্গিতের ব্যবহার প্রচলিত। বেদের যুগেও দেখেছি ভিন্ন ভিন্ন পশুকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রতীক রূপে গণ্য করা হত। উত্তরকালে সুউচ্চ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত বৃহদায়তন পশুমূর্তিকে কোথাও হিন্দু দেবদেবীর প্রতীক কোথাও দিক্‌পতিদের প্রতীক, কোথাও ভগবান বুদ্ধ বা জৈন তীর্থঙ্করদের প্রতীক বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলায়

যে সব-অলঙ্কার মণ্ডিত জানোয়ারের আকৃতির পুতুল পাওয়া গিয়েছে সেগুলিকে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য দেবতার প্রতীক বা বাহন বলেই অনুমান করা হয়। ছাঁচে গড়া মূর্তির মধ্যে আছে অনেক বিচিত্র গড়নের একক বা একাধিক নারী মূর্তি খচিত ফলক। একক মূর্তিগুলিকে সাধারণত যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এইসব মূর্তির গড়নে, অলঙ্কার ও পোযাক পরিচ্ছদে দাঁড়াবার বিচিত্র ভাবব্যঞ্জক এবং লাস্যপূর্ণ ভঙ্গীতে অতিশয় আত্মসন্তুষ্টিতে গরীয়ান, বৈষয়িক প্রাচুর্যে আত্মস্থ ভোগপূর্ণ সমাজের একটি সুন্দর ছবি প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। ছোট আয়তনের পোড়ামাটির মোহরের গায় সুন্দর তোরণ এবং তোরণশীর্ষে উপবেশন রত ময়ূর খচিত কয়েটি চিত্রে সেকালের শিল্পসৌষ্ঠব মণ্ডিত নগর তোরণের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লক্ষ করা যেতে পারে যে এই ধরণের নগর তোরণের কিছু পরিচয় মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালের সন্নিকট-বর্তী সাঁচীতে স্তূপবেষ্টনীর তোরণে পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতের বাইরে দক্ষিণ পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায় সুদূর জাপান পর্যন্ত অনুরূপ ছন্দের আলঙ্কারিক তোরণের ব্যবহার এখনও প্রচলিত রয়েছে!

একাধিক মূর্তি খচিত ফলকগুলির মধ্যে সঙ্গিনী ও প্রতিহারী সহ একটি নায়িকার চিত্র, চার ঘোড়ায় টানা রথে শিকারে ব্যস্ত রাজকীয় বেশভূষায় সজ্জিত পুরুষ এমনি কয়েকটি ছবি লক্ষ্য করার মত। অনুমান হয় সে যুগে প্রচলিত আখ্যায়িকা বা কোন পরিচিত ঘটনার উপকরণ নিয়েই এইসব ফলকের ছবিগুলি সাজান হয়েছিল।

এর পরের পর্যায়ে খৃষ্টীয় প্রথম থেকে ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যে ধরণের মাটির পুতুলের নির্মাণ ও ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল সেগুলির কথা এইবার বলা যেতে পারে। খৃষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিদেশাগত কুষাণ রাজবংশ রাজত্ব কর'ত। বাংলাদেশের কোন অঞ্চল এদের

প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল কিনা তা এখনও জানা না গেলেও শিল্পের দিক থেকে, বিশেষ করে প্রচলিত পুতুলের আকৃতি প্রকৃতির দিক থেকে এই সময়ে বাংলাদেশে যে-সব পুতুল চলত সেগুলি কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্যতম কেন্দ্র মথুরা এবং উত্তর ভারতের বারাণসী, শ্রাবস্তী, কৌশম্বী ইত্যাদি অঞ্চলের পুতুলের সমগোত্রীয়। এইসব পুতুলের মধ্যে নানা জাতির লোকের চেহারার আদল আনবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী যুগে বাংলাদেশের কৃষ্ণনগরের পুতুলে মানুষের আকৃতিগত এবং পেশাগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবার যে প্রয়াস দেখা যায় চেহারা, মুখ নাক চোখের গড়ন এবং পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে স্বতন্ত্রতা এবং বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট করে কুষাণ যুগের পুতুল-শিল্পীরা যেন তারই পূর্বাভাষ দিয়ে গিয়েছেন। এরপর পাটুলীপুত্রের গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা বাংলার এক বৃহৎ অঞ্চলকে যে তাঁদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তার বহু প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যুগেও মাটিতে পুতুল নির্মাণের এবং ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল; ভারতের বিভিন্ন গুপ্তকালীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ থেকে সে যুগের অসংখ্য পোড়ামাটির পুতুল পাওয়া গিয়েছে; এই যুগের সাহিত্যেও নানা ধরণের পুতুলের ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায়।

এই যুগের পুতুলে কুষাণ আমলের পুতুলের মত জাতিগত (Ethnic) এবং পরিচ্ছদগত বৈশিষ্ট্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। নানা জাতির সমাবেশে ভারত সমাজ ও মনে কুষাণ যুগে যে আলোড়ন এসেছিল, স্বভাবতই গুপ্তরাজাদের অভ্যুত্থানে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। গুপ্ত সম্রাটেরা কেবল একান্তভাবে ভারতীয়ই ছিলেন না! ভারত সংস্কৃতির কৃতি পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁরা দেশকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন এবং ভারতের সভ্যতাকেও তাঁরা দূরবিস্তারী পদক্ষেপে বহু পরিমাণে অগ্রসর হয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। এ কালের সাহিত্য এবং উচ্চকোটীর

শিল্পের জাতির এই আত্মপ্রতিষ্ঠিত রূপটি অতি সহজেই চোখে পড়ে। কুষাণ আমলের ব্যাপক ও পরিস্ফুট রূপটি স্থৈর্যহীন এবং চঞ্চলতায় পূর্ণ। এ যুগের শিল্পে অতৃপ্ত আবেগ এবং সীমাহীন তৃষ্ণার রূপটি প্রকট হলেও আত্ম সন্ধানেরও যে প্রয়াস ছিল না তা নয়; এই যুগেই সাধন পথে আত্মসমাহিত বুদ্ধ এবং তীর্থঙ্কর মূর্তি রচনার প্রয়াস বহুদূর অগ্রসর হয়। পরিপূর্ণ ভোগ ও আবেগময় জীবন পথে ত্যাগ ও নির্বাণ মার্গের আকস্মিক আবির্ভাবের ছবি কুষাণ আমলের রাজকবি অশ্বঘোষের কাব্যে যেমনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এমনটি বোধ হয় অন্য কোথাও দেখা যায় না। উপরের স্তরে অভিব্যক্ত চাঞ্চল্যের আড়ালে যে আত্মসন্ধান কুষাণ যুগে চলেছিল গুপ্ত আমলে এসে সেই প্রচেষ্টাই পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে।

ভারতবর্ষ যেন নূতন করে গুপ্ত যুগে আপনার আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। এই চেতনার স্পর্শ থেকে পুতুল শিল্পও বাদ যায় নি। এই যুগের পুতুলগুলিও যেন কোন এক গভীরভাবেতে আবিষ্ট; বহির্জগতের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগের পরিচয় এই যুগের পুতুলের কেশবিন্যাস অলঙ্কার এবং পরিধেয়ের মধ্যে থাকলেও এইসব পুতুলের আননে এবং দেহ গঠনে উচ্চ গ্রামের ভাস্কর্যের মতই একটা আত্মসমাহিত ভাবগর্ভ অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। শিল্পের জগতে পুতুলের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, সাধারণ মানুষের মনন কল্পনা রাগরঙ্গ, হাসি অশ্রুর যে ছোঁয়া পুতুল শিল্পে স্বভাবতই আশা করা যায় গুপ্ত যুগের পুতুলগুলিতে তার কিছুই বড় একটা দেখা যায় না। এই পুতুলগুলি যেন ভাবজগতে বিচরণশীল উচ্চ গ্রামের বিদগ্ধ মনের পরিপোষক কোন সমাজের সমুজ্জ্বল ছবি। পুতুল হিসাবে সাধারণ স্তরের মানুষের সমাজ ও জীবনগত চিন্তা কল্পনার বাহন হিসাবে এগুলির যথার্থতা কম। এ যেন এক অতিশয় পরিমার্জিত সমাজের আলেখ্য, আপনার রূপ ধ্যানে আত্মস্থ, আপনার সভ্যতা এবং আত্মগরীমায় সমাধিস্থ। নির্মাণ কৌশলে এবং নিখুঁত

ব্যঞ্জনায় এই যুগের পুতুল সমৃদ্ধ হলেও পুতুল হিসাবে এগুলিকে আমি খুব উচ্চ মূল্য দিতে রাজী নই।

গুপ্তোত্তর যুগে কিন্তু পুতুল আবার তার স্বরূপ ফিরে পেয়েছিল বলেই মনে হয়। পাল ও সেন রাজাদের রাজত্ব কাল বাংলার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট যুগ—পাল সেন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ কিছু কম পাওয়া যায় নাই; বস্তুত কিছুদিন আগেও বাংলার প্রাচীন ইতিহাস বলতে পাল এবং সেন যুগের ইতিহাসকেই বোঝাত। বাংলার প্রচলিত কিম্বদন্তী আর সাহিত্যাদিতেও সেন এবং কিছু পরিমাণে পাল রাজাদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই বাংলার অতীত ইতিহাসের গণ্ডী নির্ণিত হত। কিন্তু পরে প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ এবং তাম্রপট্টলী এবং কিছু সংখ্যক খোদিত লেখা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাস আস্তে আস্তে ক্রমে আরও প্রাচীন কালের দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। তবুও অতীতের কোন যুগের ইতিহাসই এখনও পাল এবং সেন যুগের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নাই। অবশ্য পাল এবং সেন যুগ ইতিহাসের উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে থাকলেও আমরা যে উপকরণ নিয়ে এখানে আলোচনা করছি, সেই পুতুল কিন্তু এ যুগ থেকে খুব বেশী পরিমাণে আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নাই। এ যুগের প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ যে সমস্ত স্থান বা অঞ্চল ঐতিহাসিকের সন্ধানে এসেছে সে সব অঞ্চলে স্বভাবতই দীর্ঘকাল জনবসতি ছিল; এইসব স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে গৌড়ই প্রধান; অন্যান্য অনেক অঞ্চল থেকেও পাল বা সেন রাজাদের কীর্তির মধ্যে জড়িত মন্দির বা মূর্তি ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এইসব অঞ্চলের অধিকাংশই কিন্তু সেন রাজত্বের অবসানে মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত এবং বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে বিশেষ করে পাল—সেন আমলের পুতুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ঘটেনা। অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির ছাড়া পাল আমলের অন্য কোন প্রত্নসম্ভার সমৃদ্ধ অঞ্চল এখনও ব্যাপকভাবে অন্বেষণ করা

হয় নাই। মালদহের গৌড়ে বা পাণ্ডুয়ায় হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে বা পাণ্ডুয়ায়, নবদ্বীপের সন্নিকটে লক্ষণসেনের ভিটায়, বানগড়ে বা বেড়াচাঁপায় পাল বা সেন আমলের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া গিয়ে থাকলেও এ যুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভবপর হয় নাই।

পুতুল হিসাবে গণ্য না হলেও পাল সেন যুগে মাটিতে গড়া এমন কতগুলি মূর্তি পাওয়া গেছে যে সব মূর্তিকে পুতুলেরই সমগোত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের মূর্তির মধ্যে পাহাড়পুরের মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে লাগানো মূর্তিগুলিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুরের মন্দিরটি একটি বৌদ্ধ বিহারের মূল মন্দির রূপে নির্মিত হয়েছিল। এই বিহারের নাম ছিল সোমপুর মহাবিহার। পালবংশের প্রখ্যাতনামা সম্রাট ধর্মপাল ছিলেন এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ঠ্য এর গড়নে। মন্দিরের ভিত্তি নক্শার প্রত্যেকটি বাহু মাঝখানে বেশ খানিকটা করে বাড়ানো ; উপরের দিকে আবার মন্দিরটি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে ; ভেতরটাতে ছোট একটা ফাঁপা চৌকোনো গর্ত আছে উপর থেকে অনেকটা নীচে পর্যন্ত ; এ ছাড়া সবটাই জমাট। মন্দিরের শীর্ষে কি ছিল এখন আর নিশ্চয় করে বলা যায় না। প্রাচীরের গায়ে নানা প্রকারের মূর্তি খচিত রয়েছে দেখা যায়। এই সব মূর্তির মধ্যে কতগুলি পাথরের তৈরী ; গঠনের বৈশিষ্ট্যে এবং দেহের ডৌলে এই মূর্তিগুলিকে পালযুগেরও পূর্বেকার তৈরী বলে অনুমান হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ী পুরাণ কাহিনী থেকে গৃহীত বিষয় বস্তুর উপর এই সব মূর্তি গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে কৃষ্ণলীলা এবং শিব বিবাহাদি দৃশ্যের প্রাধান্য থেকে মনে হয় নিজেদের মন্দিরে অলঙ্কার সজ্জার জন্য নির্মাতারা কোন পূর্বতন প্রতিষ্ঠান থেকে এই মূর্তিগুলি আহরণ করে এনেছিলেন। এই মূর্তিগুলি ছাড়া প্রাচীরের গায়ে আর যে সব মূর্তি আছে সেই সব মূর্তির সবকটিই কিন্তু সোজাসুজি বৌদ্ধধর্মের

পরিপোষক নয়। অবশ্য ধ্যান সমাহিত বুদ্ধ বা অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি দেবতার কিছু প্রতিমা এই মূর্তিগুলির মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য মূর্তির অধিকাংশই সমসাময়িক সমাজ জীবনের ছবি বলে মনে হয়। এই সব ছবির বৈশিষ্ট্য, এগুলির অধিকাংশই একক ভাবে, এক বা একধিক মূর্তি খচিত ফলকের আকারে প্রাচীরের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলকগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গীতে দাঁড়ানো বা বসা অনেক নর নারীর মূর্তি আছে। এই সব নর-নারীর দেহ গঠনে, পোষাক পরিচ্ছদে এবং আদব কায়দায় যে সব লক্ষণ সুস্পষ্ট তা থেকে মূর্তিগুলিকে তখনকার যুগের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতিরূপ বলেই অনুমান হয়; এই সব অধিবাসীদের বেশির ভাগই ছিল আদিবাসী শবর-শবরী ; বর্তমান কালের কোচ, হাজং, ডাফলা মিকির ইত্যাদি অধিবাসীদের পূর্বগামী। এই সব ফলকের কতকগুলি স্পষ্টই ছাঁচ থেকে তৈরী বলে বোঝা যায় ; অন্যগুলি শিল্পীরা যেভাবে এখন প্রতিমা তৈরী করেন সেই ভাবে হাতের ডৌলে নির্মান করা হয়েছিল। মূর্তিগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস এবং কর্মরত অবস্থার অভিব্যক্তিতে অত্যন্ত সহজ এবং অনায়াস লব্ধ ক্রিয়া কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। মাছ ধরা, শিকার করা, ছাগল ভেরা চরান, নর-নারীর সমবেত নৃত্য ইত্যাদি যে সব দৃশ্য এই ফলকগুলিতে দেখা যায় তাতে শিল্পীর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা এবং দেখা জিনিষটিকে তার ভাব সমৃদ্ধি সমেত নিপুনভাবে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্বের তারিফ না করে পারা যায় না। পাহাড়, জঙ্গল, জল এবং প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্যও তাদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি ; সেই সঙ্গে আছে তাদের চারদিককার পশু জগত। দক্ষ অনুভূতিবাদী আধুনিক শিল্পীর মতই অনায়াস কৌশলে তারা জল, জঙ্গল পাহাড়কে রূপ দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে নিখুত পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন বাস্তবপন্থী শিল্পীর মত সৃষ্টি করেছিল তাদের পশু পক্ষীগুলিকে। কিছু দিন আগেকার তৈরী পাথরের মূর্তিগুলিতে

ডৌলের যে বৈশিষ্ট ছিল মাটিতে গড়া ফলকের মূর্তির বৈশিষ্ট তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; গুপ্ত যুগের মূর্তিতে লালিত্যের এবং সুষমার যে সমাবেশ দেখা যায় পাথরের অভিজাত মূর্তি শিল্পের সেই বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী যুগের পাথরের মূর্তি শিল্পে বর্তেছিল। এই আভিজাত্য, কমনীয় দেহশ্রী এবং লাস্যময় ভাবগর্ভ অঙ্গভঙ্গী পাথরের মূর্তি এবং প্রতিমা শিল্পকে বিশিষ্ট করে রেখেছিল। এই সুমার্জিত মূর্তি শিল্পে শিল্পীর গভীর সাধনা, দীর্ঘ অনুধাবন এবং যত্নশীল আত্মপ্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। মাটির গড়া ফলকগুলিতে কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ সাধনা লব্ধ অভিব্যক্তির কোন পরিচয় নাই। এই সব মূর্তির দেহ গঠনে সযত্ন সৃষ্ট লালিত্য, কমনীয়ভাব বা ডৌলের বিশেষ বালাই নাই। অত্যন্ত সহজ ও অনায়াস লব্ধ কৌশলে এই ফলকগুলি গঠিত হয়েছিল; শিল্পী সচেতন আয়াসে মূর্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বেশবাস বা ভঙ্গীকে পরিমার্জিত করবার কোন প্রয়াসের পরিচয় রাখেনি। এই খানেই এই সব ফলকের সঙ্গে পুতুলের শিল্প লক্ষণের সাদৃশ্য। পুতুলেও প্রচলিত ভাবে শিল্পীর এই অনায়াস লব্ধ কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুপরিকল্পিত বিন্যাস বৈশিষ্ট্য বর্জিত, সহজ ও অনাড়ম্বর কোন গভীর ইঙ্গিত হীন প্রত্যক্ষ আবেগে সমৃদ্ধ এই ফলকগুলিতে সেকালের পুতুলের শিল্পধারাই অভিপ্রকাশ দেখা যায়।

ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিল্পের বিবর্তন ক্ষেত্রে পাহাড়পুর মন্দিরের এই ফলকগুলির যে একটা বিশেষ মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। বহু প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের ভাস্করেরা মূর্তি নির্মাণে পারদর্শীতা অর্জন করেছিল; হরপ্পায় বেলেপাথরের তৈরী দুইটি মূর্তির খণ্ডিতাংশ পৃথিবীর শিল্পানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নির্মাণ কৌশলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাস্তবানুগ ডৌলে, ত্বকের অনুভূতিপ্রবন মসৃনতায় এই মূর্তি দুটিতে যে আভিজাত্য এবং উচ্চস্তরের শিল্পে কৃতিত্বের ছাপ পড়েছে তাথেকে ভারতবর্ষের ভাস্কর্য শিল্প যে অতি খুব উন্নতি লাভ করেছিল সে

সম্বন্ধে প্রাচীন কালেই নিশ্চিত হওয়া যায়। সুপ্রাচীন সেই তাম্র প্রস্তর সভ্যতার যুগে শিল্পীরা কেবল পাথর নয়, ধাতু ঢালাই করে মূর্তি নির্মান করবার কৌশলও যে আবিষ্কার করেছিল মহেঞ্জোদরো তে পাওয়া কয়েকটি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি থেকে তার প্রমান পাওয়া যায়। এই সব অভিজাত উপকরণে নির্মিত উচ্চ গ্রামের ভাস্কর্যের পাশাপাশি সেই তাম্রপ্রস্তর যুগের এক শ্রেণীর মাটির পুতুলও যে ব্যাপকভাবে নির্মিত ও ব্যবহৃত হত তার কথা আগেই বলেছি। অনুভূতি প্রবল বাস্তবানুগ অভিজাত শ্রেণীর মূর্তির পাশে এই পুতুল শ্রেণীর মূর্তি নির্মান কৌশলের বৈশিষ্ট্য শিল্পানুরাগী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সমাজে অতি সহজেই পাশাপাশি যেমন বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতি এবং আচার ব্যবহারে অস্তিত্ব দেখা যায় তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও সমভাবের এই স্তরগত বৈষম্যের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। সমাজের উচ্চ কোটার মানুষ যখন নিজের মার্জিত এবং পরিশীলিত রুচি এবং নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগে অভিজাত শিল্প সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছে; তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে ভাব ও ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ অভিজাত শিল্প। সাধারণত ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পাথর ও ধাতুই হয়েছে এই অভিজাত শিল্পের বাহন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মন ও বুদ্ধিতে কালের পরিবর্তন খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। পরিশীলিত উচ্চ স্তরের সমাজ সংস্কারের সঙ্গে তারা সামঞ্জস্য বিধান করেছে, ঐ সমাজের অর্জিত সংস্কারের নির্যাস নানা স্তরের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে নিচের দিকে এসে থাকলেও সাধারণ মানুষ তার চিরাচরিত সংস্কারকে ধরে থাকবার প্রাণপণ প্রয়াস করেছে। এই ভাবে সমাজের নিম্নতর স্তরে এক বিচিত্র ধরণের সভ্যতার উন্মেষ ও বিবর্তন হয়েছে। এই সভ্যতায় উচ্চ স্তরের অর্জিত সংস্কারের প্রভাব অনুভূত হলেও ভাব ও পরিকল্পনার চিরাচরিত পথ তারা ত্যাগ করে নাই ঐ সংস্কারের সঙ্গে তারা বিভিন্ন দিক থেকে অনুভূত অন্যান্য সংস্কারকেও মিলিয়ে নিতে চেয়েছে এবং তাতে বহুল পরিমাণে সাফল্য ও লাভ করেছে। এদিকে

আবার মন তাদের যেমন সরল ও আদিম ধর্মী থেকে গিয়েছে তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রে উপকরণ আহরণে এবং নির্মান ও অভিব্যক্তির কৌশলে এই শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষিত শিল্প স্বভাবতই চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে ক্বচিৎ এই শ্রেণীর মধ্যে পাথর ধাতুর অনুরূপ অভিজাত উপকরণের ব্যবহার দেখা যায়। এই সব উপকরণের দুর্মূল্য যেমন এর একটা কারণ, এই সব উপকরণের নির্মান কৌশলের জটিলতাও তেমনি তার অন্য একটি কারণ। যখন সাধারণ শ্রেণীর মানুষ পাথর বা ধাতু দিয়ে মূর্তি নির্মান করেছে তখন সেই মূর্তি মূল উপকরণ মাটি বা বেত বা শোলা ইত্যাদি উপকরণের আভাষ বর্জন করে নিজের সত্বায় প্রতিথিত হতে পারে নাই। এই ভাবে আদিম উপকরণ এবং আদিম নির্মান কৌশল সাধারণ শ্রেণীর লোকের ব্যবহৃত শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে থেকে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের আর্থিক সঙ্কুলনে কম; তাই তার উপভোগের ক্ষেত্রেও সঙ্কীর্ণ। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই লোক শিল্প আপন বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও তার মৌলিক সংবেদনের বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই তা হলেও সহজ এবং অনুভূতিশীল গণ্ডীর মধ্যে যখনই সুযোগ এবং সামর্থ হয়েছে লোক-শিল্প জীবন রসে সমৃদ্ধ এবং রূপ ও বর্ণের বৈচিত্র্যে গরীয়ান হয়ে উঠেছে। অভিজাত শিল্পের ভাব সমৃদ্ধি এবং ব্যাপকতা যেমন অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের মঁনন কল্পনার প্রসার এবং সভ্যতার সমৃদ্ধির পরিচায়ক সাধারণ স্তরের পুতুলের বর্ণ সমৃদ্ধি এবং ব্যাপকতা ও তেমনি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের প্রাণ প্রাচুর্যের পরিচায়ক বলে গ্রহন করা যেতে পারে। সমাজের উন্নততর স্তরের মানুষেরা যেখানে সাধারণ মানুষকে দমন করে নিজেদের আধিপত্য এবং শোষণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে সাধারণের শিল্প ব্যাপকতা বা প্রাচুর্য লাভ করতে পারেনি। সভ্যতার সামগ্রিক রূপ সেখানে অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ। মিশর,

গ্রীস বা রোমে উচ্চ কোটির শিল্প প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করে থাকলেও সমসাময়িক যুগের শিল্প থেকে সেইসব প্রাচীন সভ্যদেশের সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাম্রপ্রস্তর যুগের ভারতীয় সভ্যতায় কিন্তু উচ্চ স্তরের শিল্পকলার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবহার ও উপভোগের শিল্পেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পার উচ্চস্তরের নাগরিকেরা যখন নিপুণ কারু-কার্য শোভিত পাথরের নৃত্য মূর্তি বা শিলমোহর নির্মাণ করছিল, সাধারণ লোকের উপভোগের জন্য তখন মাটির মূর্তির অসংকুলান হয়নি। বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত জীবনের অভিব্যক্তি আজও সেই যুগের আবিষ্কৃত উপকরণ থেকে পাওয়া যায়।

ভারত সংস্কৃতির এই বিশেষত্ব পরবর্তী যুগের সভ্যতার যে সব উপকরণ পাওয়া গিয়েছে তা থেকেও বেশ বুঝতে পারা যায়। মৌর্য যুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্প বিস্তৃতি লাভ করেছিল তার গতি প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এই শিল্পের ধারাবাহিক বিবর্তনের কোন ইতিহাস না পাওয়ায় অনেক ঐতিহাসিক এই শিল্পকে পশ্চিম এশিয়া তথা পারস্যদেশের অ্যাকা-মিনিড শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারতীয় শিল্পের ধারাকে অনুসরণ করলে কিন্তু অশোকের শিল্পকে সম্পূর্ণমাত্রায় বৈদেশিক শিল্পের প্রভাবগ্রস্ত বলে মনে হয় না। বরং এই শিল্পকে প্রচলিত ধারার ভারত শিল্পেরই মার্জিত ও অভিজাত রূপ বলে অভিহিত করা সমীচীন। এই যুগের আগে থেকেই ভারতবর্ষে একটা সজীব ও গতিশীল লোকশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। প্রাকমৌর্য আমল থেকেই লোকশিল্পের অন্তহীন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মৌর্য যুগের বেশ কিছুদিন আগে থেকে মাটিতে তৈরী যে সব পুতুল ও মূর্তি তৈরী ও ব্যবহৃত হচ্ছিল তার যথেষ্ট নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। লোকশিল্পের অন্যান্য কোন উপকরণের আজ আর কোন অস্তিত্ব না থাকলেও এই পুতুল ও

মূর্তি থেকেই এ যুগের প্রাণবান লোক শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্য যুগেও এই পুতুল ও মূর্তি ব্যাপকভাবেই নির্মিত ও ব্যবহৃত হচ্ছিল। সম্রাট অশোক যে প্রেরণায় ও প্রয়োজনে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রতী হয়েছিলেন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা তার অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে থাকলেও অন্তত নন্দ-বংশের রাজারা যে চক্রবর্তীত্ব লাভ করেছিলেন এ কথা তারাও অস্বীকার করতে পারেন না। তার পূর্বে ভরত বা কুরুবংশীয় রাজারা দীর্ঘকাল ভারতে চক্রবর্তীত্ব ভোগ করে গিয়েছেন এ কথা ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। এদের আমলের কোন দরবারী শিল্পের সন্ধান না পাওয়া গিয়ে থাকলেও তাঁরা যে দরবারী শিল্পের প্রয়োজন অনুভব করেননি বা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে রাজকীয় বা দরবারী শিল্প আত্মপ্রকাশ করেনি—এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু প্রকৃত চক্রবর্তীত্বের ধারা মৌর্য রাজবংশের সঙ্গেই বিলোপ পেয়েছিল এবং শুঙ্গরাজারা হয়ত প্রাচীন শিল্পধারারই পরিপোষক ছিলেন। এই কারণে শুঙ্গবংশীয় সম্রাটদের দরবারী শিল্পের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে গতানুগতিক সংস্কার থেকে এক পা এগিয়ে শিল্পে পাথরের ব্যবহারে উৎসাহ দিয়ে ভারত-শিল্পে এক যুগবিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন। সম্রাট অশোক তাঁর নিজের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী শিল্পে পাথর ব্যবহার করে প্রচলিত দরবারী ও রাজকীয় শিল্পকে স্থায়ী উপকরণে রূপায়িত করে থাকলেও তার উত্তরাধিকারী শুঙ্গবংশীয় সম্রাটেরা তা করেন নি। এই কারণেই অনেকে মনে করেন যে দরবারী শিল্পের ধারা অশোকেই আরম্ভ ও অশোকেই শেষ; শুঙ্গরাজাদের আমলে বৌদ্ধরা যে স্তূপপ্রাচীর নির্মাণ করেছিল তাতে প্রচলিত লোক শিল্পেরই প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্রাট অশোক শিল্পের উপকরণ হিসাবে পাথরের ব্যবহার প্রবর্তনের আগে অনুমান হয় যে উপকরণ হিসাবে পাথরের ব্যবহারের বিশেষ অনুমোদন ছিল না।

পরেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা দীর্ঘকাল শিল্প কর্মে পাথরের ব্যবহার করেন নাই। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় শত বৎসর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব পাথরের মূর্তি বা অন্যান্য শিল্প কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তা হয় বৌদ্ধ বা জৈন সম্প্রদায়ের বা বিদেশাগত রাজন্য বা রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ ছয় শত বছর ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা কি কারণে পাথরের ব্যবহার করেননি তার কোন কারণ এখনও নির্ণিত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই প্রস্তরে রচিত ভাস্কর্যে ক্রমে লোক-শিল্পের পর্যায় থেকে অভিজাত শিল্পে ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলি প্রত্যক্ষ করা যায়। মনে রাখা দরকার যে এই পর্যায়ের শিল্পের দেশীয় পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আর সম্রাট বা রাষ্ট্র পরিচালক অভিজাতগোষ্ঠিকে পাওয়া যায় না; এই আমলের দেশীয় পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রেষ্ঠী বা বণিক এবং শিল্পী-শ্রেণীর লোক। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রনী ছিলেন যবন (গ্রীক্) বা শক (কুষাণ) বংশীয় নরপতিরা।

অবশ্য এ যুগেও অভিজাত শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই সাধারণের উপভোগের শিল্প সমান দীপ্তির সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। ক্রমে অভিজাত শিল্প প্রধানত ধর্মকে আশ্রয় করেই বিবর্তিত হতে থাকে—প্রতিমা, চিত্র এবং মন্দিরে এই শিল্পের অভিব্যক্তি প্রকাশ লাভ করে। দীর্ঘ পরিশীলন ও ধ্যানলব্ধ আত্মজ্ঞান এই শিল্পের মাধ্যমে যখন অভিজাত ও অনভিজাত নির্বিশেষে সকলকে অভিসিঞ্চিত করছিল লোকায়ত শিল্প, কিন্তু সেই যুগেও ক্রান্তিগ্রস্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত লোকায়ত শিল্পের বহু নিদর্শন বারাণসীর রাজঘাট, উত্তর প্রদেশের অহিচ্ছত্র, কৌশম্বী, বাংলার চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পাহাড়পুরের মন্দির প্রাচীরে এই লোকায়ত শিল্পেরই নূতন রূপবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এ যাবৎ লোক শিল্প ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে

কিছু কিছু যে না ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত ভারহুত ও সাঁচীর স্তূপ প্রাচীরে, বুদ্ধগয়ার মন্দির পরিক্রমণ বেষ্টনীতে এবং উড়িষ্যার খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহামুখে পাথরের গায় খোদাই করা কাঠ, মাটির তৈরী মূর্তি এবং পটে আঁকা ছবির অনুসরণে তৈরী বহু চিত্রালেখ্য ও মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক যুগের লোক শিল্পের প্রত্যক্ষ সন্ধান পাওয়া না গেলেও ধর্মীয় প্রেরণায় শ্রেষ্ঠী বা শিল্পীগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় রূপায়িত এইসব শিল্প কর্মের আকৃতি বিন্যাস ও দেহ গঠনে সমসাময়িক লোক শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই শিল্প নিতান্তই ধর্মভিত্তিক এবং সমসাময়িক লোক শিল্পের বিষয়-বস্তুর বিশেষ কোন পরিচয় এইসব শিল্পে পাওয়া যায় না। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের কেন্দ্রে নির্মিত মন্দিরে শিল্পীকে বিষয়-বস্তু নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল বলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত কৃষ্ণলীলা বা শিবলীলা বিষয়ক প্রস্তর ফলকগুলি হয়ত মন্দির নির্মাণের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। মন্দির নির্মাণের শেষে মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকেরা এই ফলকগুলি সংগ্রহ করে মন্দির প্রাচীরে খচিত করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস করেন। অপূর্ব শিল্প—নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ সুন্দর ও সুঠাম গঠনের ফলকগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন গোঁড়ামিকে তাঁরা প্রশ্রয় দেননি; তেমনি মাটিতে গড়া ফলকগুলির ক্ষেত্রেও তাদের গোঁড়ামির অভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই ফলকের বিষয় বস্তুগুলি নিতান্তই সমাজ নির্ভর এবং প্রত্যক্ষ ধর্মাশ্রয়ী বলে কোনমতেই অনুমান করা যায় না। আবার যে সমাজের ছবি এই ফলকগুলিতে দেখা যায় সেই সমাজও সভ্য, বর্ণশাসিত সমাজ নয়। আদিবাসী, বন্য ও বর্ণবহির্ভূত নরনারী, নর্তক, নর্তকী, বাদক ইত্যাদি ও বিবিধ জন্তু-জানোয়ারের ছবিতে সমৃদ্ধ এই ফলকগুলি সে যুগের পারিপার্শ্বিক সমাজের ও জগতের নিখুঁত আলেখ্য এবং সমাজ সচেতন লোক শিল্পীর প্রতিভার সৃষ্টি বলেই

অনুমান করা যেতে পারে। উপকরণ হিসাবে মাটি লোক শিল্পেরই উপজীব্য; নির্মাণ কৌশল এবং নির্মিত মূর্ত এবং দৃশ্যের বিন্যাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে এবং পশুমূর্তির চিত্রনে যে আদিম এবং প্রারম্ভিক শিল্পকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় তা এই মন্দিরেরই সংলগ্ন অভিজাত শ্রেণী মূর্তি ও ফলক থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং প্রচলিত লোক শিল্পের ধারার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। মন্দির-প্রাচীরে এই ধরণের ফলকের ব্যবহার যে এ যুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের বানগড়, মহাস্থান, সাভার এবং ময়নামতি থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ফলক থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সাধারণ মানুষের আবেগপ্রবণ আদিমধর্মী জীবন-সমৃদ্ধ শিল্পের অন্যতম অভিব্যক্তি হিসাবে এই ফলকগুলি চিরকালই সমাদর লাভ করবে।

এই আবেগ প্রবণতা ও প্রাণধর্ম বাংলার শিল্প কর্মে দীর্ঘকালের জন্য আসন গ্রহণ করে থাকলেও সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান আক্রমণের পর প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বহু সৌধ ও মন্দির একে একে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হতে থাকে; নূতন কোন প্রয়াসও বহুকাল রূপ গ্রহণ করতে পারে নাই। মুসলমান আক্রমণের প্রথম বিপর্যয়কে অতিক্রম করে সমাজকে আত্মস্থ হতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল; ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা পুনরায় ভাল করে মাথা তুলতে পারে নাই। তবে তার আভ্যন্তরীণ শক্তি সাময়িক ভাবে নির্বাপিত যজ্ঞাগ্নির মতই প্রধূমায়িত অবস্থায় ছিল; অচিরে অনুকূল আবহাওয়ায় দীপ্তিমান হয়ে উঠতে তার বিলম্ব হয় নাই। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস পথে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই মহাগ্রন্থ বাংলার সেই দুর্দিনে দৃঢ় অবলম্বনের মতই ছিন্ন ভিন্ন সমাজ ও মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ের পথে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব বহন

করেছিল। এই গ্রন্থ দুইটি সে যুগের বাঙ্গালীর মনের গতির দিক নির্দেশও লক্ষ্য করা যায়। এই রামায়ণ ও মহাভারত রচনার কালেই বাংলাদেশ আবার মন্দির নির্মাণের প্রয়াসে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে আবার কর্মের সাড়া পড়ে যায়। সেই যুগ থেকে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলায় কত যে ছোট বড় মন্দির নির্মিত হয়েছে তার কিছু সংখ্যা নির্ণয় এখনও হয় নাই।

বাংলার সংস্কৃতি ভাণ্ডারে মুসলমান আমলে নির্মিত এই মন্দিরগুলি কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মহাকাব্য এবং অন্যান্য নানা কবির রচিত মঙ্গল কাব্যগুলির মতই অমূল্য সম্পদ; নিশ্চিত বিলোপের পথ থেকে আত্মরক্ষা করে বাঙ্গালী যে দৃঢ়তার সঙ্গে আপনার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পেরেছিল এইসব উপকরণে তার সাক্ষ্য অতি স্পষ্ট।

এই মন্দিরগুলিতে একদিকে যেমন বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে বাঙ্গালীর জনশিল্পের পরিচয়েও এইসব মন্দির অতিশয় সমৃদ্ধ। অধিকাংশ মন্দিরের প্রাচীরই অসংখ্য ফলকে অলঙ্কৃত হয়ে প্রভূত শোভা ধারণ করে বিরাজ করত। মুসলমান আমলের বাংলাদেশে নির্মিত মন্দিরগুলির গঠনকৌশলে মন্দির প্রাচীরে খচিত চিত্রফলকগুলিতে যে প্রতিভা দৃপ্ত শিল্প কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য কোন পরাধীন জাতির ইতিহাসে অনুরূপ শিল্প কর্ম সৃষ্টির পরিচয় আমার অজ্ঞাত। সত্য বলতে কি রাজনৈতিক পরাধীনতা যে বাঙ্গালীকে কখনই পঙ্গু করতে পারেনি, তার প্রাণের সঞ্চয় যে কখনও নিঃশেষ হয় নাই মুসলমান আমলে রচিত বাংলা সাহিত্যে, শ্রীচৈতন্যের প্রবল ধর্ম আন্দোলনে এবং মন্দিরাশ্রিত বিপুল শিল্প কর্মে তার প্রমাণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

এই যুগের মন্দির প্রাচীরে খচিত চিত্র ফলকগুলিকে পাহাড়পুর, মহাস্থান, সাভার ও ময়নামতির মৃৎফলকে উত্তরাধিকার কালোপযোগী পরিণতি লাভ করেছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটেছিল তেমনি মন্দির প্রাচীর

সংলগ্ন ফলকগুলিতেও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত মন্দিরের আকৃতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলার হরিৎ শষ্যক্ষেত্র এবং শ্যাম বৃক্ষ-পল্লব শোভিত সমতল বিস্তৃতির পটভূমিতে যে চালা-ঘরকে নিয়ে বাঙ্গালীর জীবন, সেই চালাঘরকে অবলম্বন করেই বাঙ্গালী তার মন্দির নির্মাণ করল। মন্দির নির্মাণের প্রচলিত ও শাস্ত্রীয় বিধিনির্দিষ্ট উপকরণ ছিল পাথর, এই পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় বাঙ্গালী তার ব্যবহার ত্যাগ করল; ব্যবহার করল ইট; তেমনি শাস্ত্রীয় আকৃতির সর্বতোভদ্রাদি নক্সা ত্যাগ করে চালা-ঘরকেই সে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করল। চালাঘরের গৃহ-মুখ বিস্তৃত এবং মন্দিরের সম্মুখভাগও বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে দেখা দিল। শিল্পী দেখল এ এক অপূর্ব সুযোগ; পোড়ামাটির ফলক নির্মাণে তার পারদর্শিতা বহু যুগের। এই ধরণের ফলক পর পর জুড়ে দিলে মন্দিরে বিস্তৃত সম্মুখের ক্ষেত্রেও তার ন্যাড়া ন্যাড়া ভাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে প্রযুক্ত শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত হয়ে উঠবে। মন্দিরের প্রাচীর সুন্দর করে সাজাবার জন্য এক যথোপযুক্ত শিল্পধারার প্রবর্তন হল; টুকরো টুকরো করে ছাঁচে তৈরী করে অনেকগুলি চিত্র-ফলক হয় মন্দিরের গায়ে জুড়ে দেওয়া হত; নয়ত প্রাচীরের গায় পাতলা আস্তরণের মত টালি লাগিয়ে নরুণ পাটানি দিয়ে খোদাই করে ছবি ফুটিয়ে তোলা হত। এমনি করে নূতন কৌশলে রচিত এক সমৃদ্ধ চিত্র সম্পদ আত্মপ্রকাশ করল যার বিষয়বস্তু প্রধানত রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলা নির্ভর। এ ছাড়া বৃষবাহন শিবের নানা ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত চিত্রফলকও অনেক মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করল। মন্দিরের পর মন্দিরে ছোট বড় অসংখ্য ফলকে কত যে বিচিত্র দৃশ্য কত নৃত্য-গীতের বৈচিত্র্য, কত দেবদেবী, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত জীবন কাহিনী মুখর আবেগে শোভাযাত্রা করে চলেছে অন্তহীন প্রাণ চঞ্চল এক মনোহর গতিভঙ্গে।

এই ফলকগুলির নির্মাণ কৌশল অনুধাবন করলে কয়েকটি রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ছাঁচ থেকে তৈরী করে মন্দিরের

প্রাচীরে 'বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এ রকম কিছু ফলক কয়েকটি প্রাচীর থেকে পাওয়া গিয়েছে। ঢাকা বিক্রমপুর থেকে সংগৃহীত কৃষ্ণকুব্জা সংবাদ সম্বলিত কয়েকটি ছাঁচে ঢালা ফলক আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। অধিকাংশ ফলকই অবশ্য এক একখণ্ড টালিকে প্রয়োজন মত খোদাই করে তৈরী করা। তবে কোথাও কোথাও একই দৃশ্যের ভিন্ন অংশ একাধিক ফলকেও খোদাই করা হ'ত। এইসব ক্ষেত্রে একই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একাধিক ফলকে খোদাই করে ফুটিয়ে তোলারও পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের অলঙ্করণে প্রধানত ধর্মভিত্তিক বিষয়বস্তুরই ব্যবহার প্রচলিত ছিল সমধিক। বিশেষকরে প্রবেশ দ্বারের ঠিক উপরে রাম রাবনের যুদ্ধের বলদৃপ্ত গতিমুখর ছবি অধিকাংশ মন্দিরের শোভাবর্ধন করত। এ ছাড়া সীতার বিবাহ এবং রামাভিষেকের দৃশ্যও বেশ আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে উৎকীর্ণ করা হ'ত। মুর্শিদাবাদের বড়নগরে রাণীভবানী নির্মিত মন্দিরের প্রাচীর সজ্জায় উৎকীর্ণ দৃশ্যাবলী তক্ষণনৈপুণ্যে যে বৈশিষ্ট অর্জন করেছিল তার তুলনা বিরল। বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন মন্দিরেও বিশেষ করে শ্যামচাঁদের মন্দিরের ফলকগুলিও শিল্পগৌরবে সমৃদ্ধ। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী ও গোঁড়াচাঁদের মন্দিরের প্রসিদ্ধিও কম নয়। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী ইত্যাদি অঞ্চলে যে অসংখ্য চিত্রালেখ্য শোভিত মন্দির আছে অবিলম্বে তার অনুসন্ধান করে তালিকা রচনা করা, এবং যত্নের সঙ্গে এই সমস্ত মন্দিরগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

সমাজ চিত্র হিসাবেও এই মন্দির প্রাচীরের অনেক ছবিকেই বিশেষ অর্থপূর্ণ বলে গন্য করা প্রয়োজন। নরনারীর দেহগঠনে, পোষাক-পরিচ্ছদে, অলঙ্কারে, গৃহের আকৃতিতে ও অভ্যন্তর সজ্জার তৈজসপত্রের আসবাবে-আবরণে, পাল্কি, গাড়ী, নৌকো ইত্যাদি যানবাহনে, বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি হাতিয়ারে মুসলমান যুগের

বিশেষ করে এই যুগের শেষ ভাগের একটা অপূর্ব নিখুঁত ছবি এই চিত্রগুলি থেকে গড়ে তোলা যায়। এই ছবিগুলিতে যেন সেই নবাব বাদশা তাদের রাজসভা, তাদের আশ্রিত জমিদার মনসবদার, সিপাই শান্ত্রী, পাইকবরকন্দাজ, ফরাদমশালচি, হারেমের মণিরত্ন-সমালঙ্কৃত বেগম এবং তাদের বাঁদী ইত্যাদি নিয়ে একটা বিচিত্র সমাজ, একটা বিচিত্র জীবন প্রণালী, একটা চলমান ছন্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যে জীবন এই বাংলারই ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, ফেলে রেখে গিয়েছে তাদের পায়ের চিহ্ন এর সহরেও বন্দরে।

এই সমাজ জীবনের যারা ছিল কারিগর, যারা বহন করে নিয়েছিল এই জীবনের চাকা, নিজেদের মেহন্নত দিয়ে তাদেরও ছাপ পড়েছে এইসব চিত্রফলকে; বিগত দিনের বিস্তৃত ইতিহাসের চলচ্ছবি আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকলেও নিঃশেষ হয়ে যায়নি; যা কিছু ছাপ তার রয়ে গেছে তা এই মন্দির প্রাচীরের গায়ে বৈশিষ্ট্যময় এই ফলকগুলিতে। বেশ নিখুঁত অভিজ্ঞতা নিয়ে সাধারণ চোখে দূর থেকে দেখা বিস্তৃত কর্মমুখর সমাজের ছবি ধরে রেখে গিয়েছেন সে যুগের জনতার শিল্পী; সাধারণ মানুষের দেখবার বুঝবার এবং উপভোগ করবার জন্য। মুসলমান আমলের বাংলার মন্দিরে উৎকীর্ণ কারুকার্য এবং চিত্রালেখ্যের বুঝি তুলনা নাই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাতে প্রাচীন লোক সংস্কৃতির যে সব ধারার দ্রুত অবলুপ্তি ঘটেছিল বাংলার মন্দির শিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। ইংরাজরা এ দেশে জাঁকিয়ে বসবার ঠিক আগে রাণী ভবানী বড়নপরে যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাতেই মন্দিরে উৎকীর্ণ চিত্রালঙ্কারণের শেষ দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়। এর পর প্রাচীন আদর্শে যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছে কলিকাতার দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণি নির্মিত কালীমন্দিরই তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এর পরে বাংলাদেশে বাংলারীতির আর কোন উল্লেখযোগ্য মন্দির তৈরী হয় নাই। একটা প্রবল স্রোতধারা যেন বর্তমান যুগের

প্রারম্ভে এইখানে এসে নিজেকে শেষবারের মত দেখা দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেল—একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতির অবসান ঘটল। পুরোপুরি রক্ষিত হলেও এর প্রাচীরে প্রচলিত ধারার চিত্রফলকের ব্যবহার দেখা যায় না। মন্দিরসজ্জার জন্য তৈরী মাটির ফলক এবং মূর্তি নির্মাণের কৌশল এইবার হারিয়ে গেল, বিলুপ্তি ঘটল একটা দীর্ঘকালের শিল্পধারার।

একদিকে মুসলমান যুগে প্রচলিত শিল্পধারাকে অবলম্বন করে যেমন মন্দিরের প্রাচীরে ব্যবহৃত সজ্জার ব্যাপক মৃৎফলকের প্রচলন হয়েছিল তেমনি এ যুগে নানা প্রয়োজনে তৈরী ক্ষুদ্রায়তন মূর্তির ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। মূর্তি নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ মূর্তি-গুলির নির্মাণ কৌশল এবং আকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এগুলি প্রাক্ মুসলিম যুগের ক্ষুদ্রায়তন খেলনা বা ব্রত-পার্বণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে তৈরী পুতুলেরই সগোত্র। মুসলমান আমলের প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ জনপদগুলির কোন বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান এখনও হয় নাই; ফলে এই যুগের ব্যবহৃত পুতুলের সঙ্গে বড় একটা পরিচয় ঘটে না। তবে প্রাচীন ক্ষুদ্রায়তন পুতুল নির্মাণে যে ছেদ পড়ে নাই পরবর্তী যুগে ইংরাজ আমলের তৈরী পুতুল থেকে তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়।

পুতুলের নির্মাণ ও ব্যাবহারের ব্যাপক প্রচলন খুব কমে গিয়ে থাকলেও বাংলাদেশে পুতুলের প্রচলন এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। এখনও গ্রাম বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে পুতুল তৈরী হয় এবং সেই পুতুলের বেশ কাটতি দেখা যায় মেলাগুলিতে। তবে পুতুলের প্রচলন থাকলেও তার বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট বেশ কিছু পরিমাণে লোপ পেয়েছে এবং লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় পুতুলের নির্মাণ ও কাটতিও কিছুকালের মধ্যেই লোপ পেয়ে যেতে পারে। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনই প্রথম বাংলার অন্যান্য লোক শিল্পের সঙ্গে পুতুলের মূল্যবান ঐতিহ্যের দিকে শিল্প-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; এরপর বাংলার সংস্কৃতি প্রেমিক

১০৮ ১০৯
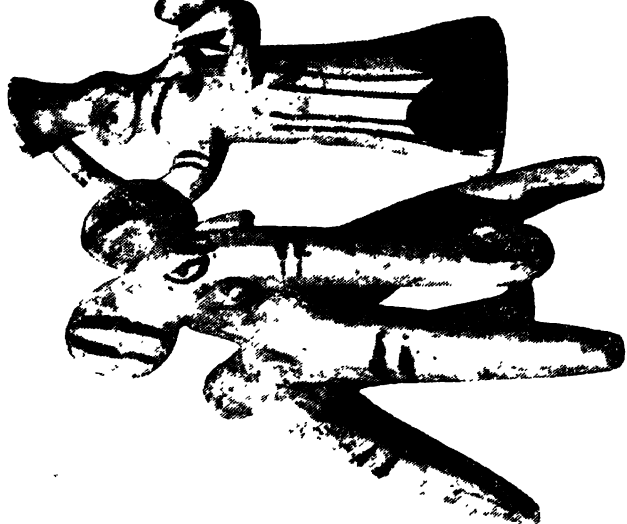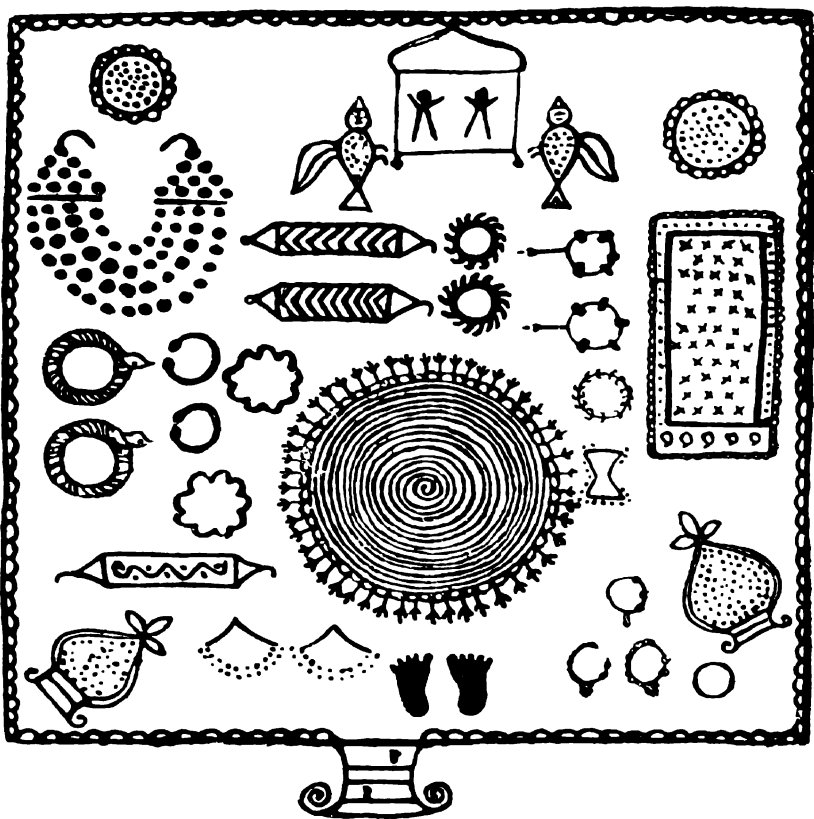
আলপনা

রাজকর্মচারী গুরুসদয় দত্ত পুতুলের মূল্যবোধে জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম সর্বপ্রথম রীতিসঙ্গতভাবে পুতুল সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে এবং বর্তমানে অন্যান্য অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পুতুল সংগ্রহ ও পুতুলের ধারাকে উৎসাহিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সংগ্রহশালাগুলিতে প্রদর্শিত পুতুলের রীতিপ্রকৃতি অনুসরণ করলে বহু অভাবিত তথ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বাংলাদেশে প্রচলিত পুতুলের এমন কতকগুলি শ্রেণী আছে যা দেখলে এ কথা প্রতীয়মান না হয়ে পারে না যে পুতুলের নির্মাণ কৌশলে এবং আকৃতিতে একটা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রবহমান রয়েছে। এই ধরণের পুতুল কাদামাটি থেকে আঙুলে টিপে তৈরী করা হয়; নাকটা এইসব পুতুলের পাখীর ঠোঁটের মতন, নাকের দুদিক চাপা, মুখ বড় একটা নির্দিষ্ট নাই। অধিকাংশ পুতুলের গায় কোন বস্ত্র বা আচ্ছাদন দেখান হয় না; তবে আলাদা করে মাটির লেত্তি থেকে তৈরী গয়না পুতুলের গায় বসানো থাকে; পুতুলের বুক আর চোখও কোন কোন ক্ষেত্রে আলাদা মাটির ডেলা দিয়ে তৈরী করে জুড়ে দেওয়া হয়; চাচর দিয়ে কোথাও কোথাও বা পুতুলের গায় আঁচড় কেটে চোখ আর অলঙ্কার দেখাবার রেওয়াজও চোখে পড়ে। এই ধরণের পুতুলের অত্যন্ত সহজ এবং অনায়াস সিদ্ধ দেহগঠন এবং চোখ, মুখ, হাত-পা, পরিচ্ছদ-অলঙ্কারের বাহুল্যহীন ইঙ্গিতনির্ভর দ্যোতনা প্রাচীন হরপ্পা সংস্কৃতির পুতুল শিল্পের সঙ্গে এই পুতুলগুলিকে সমগোত্রীয় করে রেখেছে। এই প্রবহমান ধারার পুতুলের ব্যবহার বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী হিসেবে যেমন চলে তেমনি দেখা যায় ব্রত উপলক্ষে তৈরী ষষ্ঠী বা অনুরূপ লৌকিক দেবতার ক্ষেত্রে। ষষ্ঠী ঠাকুরের পুতুল সাধারণত ছেলে-কোলে মায়ের আকৃতিতে তৈরী হয়; আশুতোষ মিউজিয়ামে ছয়টি সন্তান-কোলে উপবিষ্ট একটী ষষ্ঠী মূর্তি

আছে, যার রূপসম্ভারে আদিম প্রকৃতিতে গড়নের সংক্ষিপ্ত ব্যাঞ্জনায় শিল্প কর্মের এক অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। গোবর, পিটুলী, সর ইত্যাদি নানা উপকরণে এইসব পুতুল তৈরী হলেও কাদামাটিতে তৈরী করে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া পুতুলের প্রচলনই এই জাতের বিশেষত্ব। অপূর্ব লাল রঙের এক ধরণের পুতুল মৈয়মনসিং, ও কুমিল্লা অঞ্চলে তৈরী হত; ওখানকার শিল্পীরা এখন কিছু আসামে কিছু পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিয়েছে এবং কিছু পরিমাণে এই ধরণের পুতুল এখনও তৈরী করছে। এই সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ আদিমধর্মী পুতুলগুলিতে সাধারণত বর্ণানুলেপনের কোন প্রয়াস দেখা যায় না; কিন্তু অন্যান্য জাতের পুতুলের মধ্যে বর্ণানুরঞ্জিত পুতুলের প্রচলন এবং জনপ্রিয়তা সহজেই নজরে পড়ে। আজও বাংলাদেশে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বছরের নানা সময় নানা ধরণের মেলা বসে; আর এইসব উৎসব সংশ্লিষ্ট মেলাকে আশ্রয় করে পুতুল ব্যবসায়ীদের সমাগম ঘটে। ইতিপূর্বে জাপান ও জার্মানী থেকে আমদানী করা সস্তার চীনেমাটির পুতুল এবং বর্তমানে প্লাষ্টিকের গোত্র পরিচয়হীন ছন্দবিবর্জিত পুতুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচলিত ধারার এইসব পুতুলের প্রচলন কমে গিয়ে থাকলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নাই। এই ধরণের পুতুলের অন্য এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তথাকথিত কৃষ্ণনগরের পুতুল। এইসব পুতুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও প্রচলিত ধারার পুতুল এখনও বাজারে চলছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার এইসব পুতুল ব্যবসায়ীকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু উপযুক্তভাবে এই পুতুলকে বাঁচিয়ে রাখা বিশেষ আয়াসসাধ্য। যে কয়েকটি কেন্দ্রে এখনও পুতুল তৈরী হয় তার মধ্যে হুগলী জেলার নূতন গ্রাম, মেদিনীপুরের নাড়াজোল, চব্বিশ পরগণার মজিলপুর, নদীয়ার নবদ্বীপ ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। কালীঘাটে এক সময়ে একটি সুন্দর ছন্দের কাঠের পুতুলের প্রচলন ছিল; দুঃখের বিষয়, এই ধারার পুতুল এখন আর বড় একটা তৈরী হয় না।

বীরভূম এবং বাঁকুড়া অঞ্চলের পুতুলের গড়নে লম্বা চোঙের মত শরীর এবং সরু বাঁকানো চোঙের আকৃতির হাত ; এক হাত কোমরে অন্য হাত মাথার ওপর কিছু ধরা অবস্থায় দেখা যায়। ওল্টানো কল্কির মত শরীরের নীচের অংশ ঘাগরার মত অনেক ক্ষেত্রে লম্বা লম্বা টানা রেখায় বিশিষ্ট। ওল্টানো কল্কির মত শরীর এবং বাঁকানো চোঙের মত হাত অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুতুলের সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন তবে বর্ণানুরঞ্জিত এই ধরণের পুতুলের আকর্ষণ অধিকতর প্রবল বলেই অনুভূত হয়। এই অঞ্চলের কোন কোন পুতুলে অভ্র থেকে তৈরী সাদা রঙের প্রলেপ দেখা যায়।

নতুন গ্রামের পুতুলের গঠন বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরী পুতুলগুলির সজীব এবং বর্ণাঢ্য আবেদন সহজেই শিশু মনকে আকৃষ্ট করতে পারে ; এই রীতির পুতুলেরই সগোত্র এক ধরণের পেঁচার মূর্তি দেখা যায় ; গড়নের বৈশিষ্ট্য এবং বর্ণের দ্যোতনায় এই পেঁচাগুলি খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত নবদ্বীপের বাজারে এই ধরণের পেঁচার সন্ধান পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর বাহন এই পেঁচা এক সময়ে সম্পদ বৃদ্ধির দ্যোতক হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

নাড়াজোলের পুতুলের গড়নের বৈচিত্র্য এবং বর্ণ প্রলেপে নানা প্রকারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই পুতুলগুলি সাধারণত সাত আট ইঞ্চি উঁচু হয়, মূর্তিগুলি তৈরী করে প্রথমে তার গায় খড়ি গোলা লাগানো হয়। তারপর গিরিমাটি, হল্ভেল, নীল, প্রদীপের কাজল, আর মেটেসিঁদুর গুলে রঙ করা হয়। তারপর বেলের আঠা দিয়ে তৈরী এক রকমের প্রলেপ লাগিয়ে বর্ণের উজ্জ্বলতা বাড়ান হয় ; এই প্রলেপের অন্য এক গুণ বর্ণের উজ্জ্বলতাকে মলিন হতে না দেওয়া আর ধুলোবালি থেকে পুতুলের রঙকে রক্ষা করা। রাধাকৃষ্ণ গৌরনিতাই ইত্যাদির মূর্তি ঝাঁপিকোলে লক্ষ্মীমূর্তি, সন্তান কোলে মাতৃমূর্তি, কেড়ে মাথায় গয়লানী, লালপেড়ে শাড়ীপরা গেরস্থ বউ নাড়াজোলের পুতুলের বিষয়বস্তু। এইসব পুতুলে যেমন

একটা শান্ত বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তি আছে তেমনি সাধারণ মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনের একটা পরিশীলিত আমেজ পাওয়া যায়। এই পুতুলগুলি নিতান্তই গ্রামীণ মানুষের বড় প্রিয় জিনিষ, তাদের সরল মনের গৃহগত আকর্ষণ, ভালবাসা এবং চিত্তবৃত্তির পরিচয়ে সমৃদ্ধ।

মজিলপুরের পুতুলের গড়ন ফাঁপা চোঙের মত, দু'ভাগে তৈরী করে জুড়ে দেওয়া। এর মধ্যে কুমোরের চাকের হাঁড়ি থেকে তৈরী, মুকুট মাথায় দক্ষিণরায়ের মূর্তিগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে পুতুল গড়তে এই হাঁড়ীর ব্যবহার খুব প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে দেখা যায়। দক্ষিণরায় সুন্দরবন অঞ্চলের বাঘের দেবতা; এই দক্ষিণরায়ের সঙ্গে অনেক কিংবদন্তী, অনেক প্রচলিত কাহিনী জড়িত আছে। অদ্ভুত দর্শন মুকুট শোভিত এই দক্ষিণরায়ের মূর্তিতে যে আদিম উগ্রতা এবং রাজকীয় শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রচলিত লোকশিল্পের ক্ষেত্রে তা নিতান্তই অসাধারণ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হিন্দুদের পূজিত দক্ষিণরায়ের অনুকল্প মুসলমানদের বনবিবির মূর্তিগুলিও প্রচলিত ধারার দক্ষিণরায়ের মূর্তির মতই।

এইসব বিশিষ্ট পর্যায়ের পুতুল ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া নানা বৈচিত্র্যে শোভিত নানা ঢংএর পুতুল আশুতোষ মিউজিয়াম, আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রির ক্রাফ্ট মিউজিয়াম, পশ্চিম বাংলা সরকারের শিল্প দপ্তরের বিভাগীয় মিউজিয়াম এবং ঠাকুরপুকুরের ব্রতচারী সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়। এইসব পুতুলের উপকরণ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত। মাটি ছাড়া কাঠ আর ন্যাকড়ার কিছু কিছু পুতুলও এইসব সংগ্রহে আছে।

পুতুলের জন্ম কি সূত্রে হয়েছিল তা আজ গবেষণার বিষয়। তত্ত্ববিদেরা মনে করেন, যাদুক্রিয়ার অনুসঙ্গরূপেই পুতুলের জন্ম হয়। পরে শিশুদের হাতে খেলার সামগ্রী হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও পুতুলের সেই প্রারম্ভিক আবেদন কোনদিনই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আদিম সমাজের এবং মনের যে সংবেদন অনেক

হাজার বছর আগেকার পুতুলে দেখা যায় বর্তমানে প্রচলিত অনেক পুতুলেও তার আভাষ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই সুদীর্ঘকাল ধরে মানব সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; মানুষের মনের বিবর্তন ঘটেছে; পরিবর্তন ঘটেছে অনেক বিশ্বাসের। ক্রমে মানুষের মন অধিকতর যুক্তিনির্ভর হয়েছে; আদিম ভয় এবং অন্ধ বিশ্বাস ক্রমে শিথিল হয়ে এসেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন সমাজের সকল স্তরকে সমান ভাবে স্পর্শ করতে পারে নি। অনেক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক কোন কোন সমাজ অনেক বিষয়ে আদিম পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। কোন কোন দেশে অগ্রসর সমাজ আপনার সামাজিক বিবর্তনের চাপে আদিম সমাজকে নিশ্চিহ্ন বা আত্মসাৎ করে নিয়েছে; এইসব দেশে আপাত দৃষ্টিতে আদিম সমাজের বিবর্তনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইউরোপে আদিম সমাজ আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাইরের প্রভাবকে বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা করেছে; আফ্রিকা মহাদেশে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এই ঘটনা ঘটেছে। বিপুল আমেরিকা মহাদেশ দুটিতে এই ধরণের আদিম সমাজ ইউরোপীয় আগন্তুক জনতার দ্বারা পরাভূত এবং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে ক্রমবিবর্তনশীল সমাজের নিকট সান্নিধ্যে আদিম সমাজগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে হাজার হাজার বছর ধরে জীবন যাপন করছে; তাদের সমাজ গঠন পদ্ধতি, তাদের জীবন-যাত্রা, তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম বাইরের প্রভাবে বড় একটা প্রভাবিত হয় নি। অন্যদিকে তথাকথিত অগ্রসর সমাজেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজ গঠন পদ্ধতি, নানা প্রকারের যুক্তিহীন বিশ্বাস এবং ধর্মীয় রীতিনীতির অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলি মানুষের সমাজ গঠনের আদিম স্তর থেকে খুব বেশী অগ্রসর নয়। একই পরিবারের পুরুষ ও নারী বিশেষে বিশিষ্ট ধরণের ধর্মবিশ্বাস ও আচাররীতির পরিচয়ও সহরেই দেখা যায়। পরিবারের পুরুষেরা যেখানে পুরাণের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে ধর্ম সাধনে তৎপর, ন্যায়-

শাস্ত্রের জটিল যুক্তি-সর্বস্ব তত্ত্বে যাঁদের সহজ প্রবেশ তাঁরাও প্রতিমা পূজা, এবং বিবাহাদিতে আদিম বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত অনেক আচার পালন করছেন। সেই পরিবারেরই মহিলারা আবার উপনিষদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত বিবর্তিত ধর্মীয় উপলব্ধিকে ব্রত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ আদিম বিশ্বাস এবং যাদুভিত্তিক ক্রিয়া কর্মে পর্যবসিত করে পালন করছেন। ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ মানুষের ধর্মীয় বিবর্তনের এক বিচিত্র পরীক্ষাক্ষেত্র। সমাজ মনের এই বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে সচেতন না হলে বাংলার লোকশিল্প বিশেষ করে পুতুলের রস গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। বাংলায় প্রচলিত পুতুলের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের অসংখ্য স্তরের এবং ক্রমায়ত বিভিন্ন গড়নরূপ এবং সংবেদনের এক প্রান্তে সংক্ষিপ্ত আদিম পর্যায়ের পুতুল অন্য প্রান্তে অত্যন্ত সুপরিণত সমাজের নারীমূর্তি যার পরণে ঊর্ধ্ববাস এবং লালপেড়ে সাদা শাড়ি। এই দুই প্রান্ত সীমার মধ্যে হাজার রকমের পুতুলের বিচিত্র রকমের গড়ন, বহু বিচিত্র যার ব্যবহার, নানা সংবেদনে যা সমৃদ্ধ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পুতুল মাত্রেরই মৌলিক রূপ বা গড়ন আদিম পর্যায়ের পুতুলেরই সগোত্র। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বভাবানুগ আকৃতি পুতুলের জগতে খুব জনপ্রিয় নয়; বরং অত্যন্ত সংক্ষেপে নাক, মুখ, হাত, পা তৈরী করাই ছিল আদিম ধরণের পুতুলের বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের পুতুল স্বভাবতই হাতের আঙুলের সাহায্যে তৈরী। ক্রমে এই ধরণের পুতুলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটু স্বভাবানুগ করে করবার চেষ্টা হতে থাকে; উলঙ্গ এবং অলঙ্কার বর্জিত পুতুলের গায় অলঙ্কার আর আবরণ দেওয়া হল। সভ্যতার পথে পুতুলের অগ্রগতি হল সুরু। কিন্তু পুতুলের মৌলিক রূপটি এতেও বদলায়নি। এর পরের স্তরে এল বর্ণানুলেপন; অনেক পুতুলের গায় সুন্দর রঙ্ লাগান হল; রূপ ও রুচির বিবর্তনে পুতুলেরও আকৃতি বদলাল। সমাজের রুচির আরও বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় পুতুল নির্মাণে ছাঁচের ব্যবহারে। ছাঁচ ব্যবহারে একটা সুবিধা

হল ; একই ধরণের পুতুল একই ছাঁচ থেকে একাধিক তৈরী করা সম্ভব হল। কিন্তু বংশানুক্রমে আয়ত্ব করা পটুত্বে ছাঁচ ব্যবহার না করেও পুতুল নির্মাতারা এমন পুতুল তৈরী করত যাতে এক ধরণের একটি পুতুল থেকে অন্য একটি পুতুলকে পৃথক করা সম্ভবপর হয় না। অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে কারিগরেরা পুতুলের পর পুতুল তৈরী করত, ঠাকুর্দা থেকে বাপ, বাপ থেকে ছেলেতে এই নির্মাণ কৌশল বর্তাত ; সেই কাদামাটি, সেই মাটিকে ছেনে পুতুল করবার উপযুক্ত করে নেওয়া, তাতে মাপমত একটু চুণ একটু গোবর মেশান। পুতুলের চোখ মুখ হাত-পা শরীর ঠিক একই ধাঁচের একই রসের ভিয়ান দিয়ে তৈরী করে বাজারে উপস্থিত করা হত ; যারা এই পুতুল সংগ্রহ করে নিত তারা চিরাচরিত সেই রসেরই রসিক। কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই এই পুতুলের অর্থ বোধ হত ; এই রস গ্রহণ করবার জন্য লোককে উৎসাহিত করতে হত না। এই সমাজ যেমন প্রত্যেকটি পুতুলের গড়ন, আকৃতি ঢং এবং বর্ণ থেকে রস ও আনন্দ আহরণ করতে পারত, সেই আদিম আকৃতির পুতুল থেকে মার্জিত গড়নের আধুনিক সমাজের ছবি পর্যন্ত সমস্ত পুতুলই ছিল তাদের প্রিয়। প্রত্যেক শ্রেণীর পুতুল প্রায় সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে সমাজের প্রতি স্তরের মানুষের চিত্ত বিনোদন করত। সামাজিক বিবর্তনের নানা পর্যায়ের এবং নানা স্তরের এমন সুন্দর ছবি পুতুলের রাজ্যের বাইরে আর কোথাও বড় পাওয়া যায় না। এইসব পুতুল সাধারণ মানুষের যেমন নানা প্রয়োজন মেটাত, জোগান দিত নানা রসের তেমনি সাধারণ কারিগরের বিশদ পর্যবেক্ষণের এবং দেখা জিনিসকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতার পরিচয় বহন করত। ধর্মীয় চিন্তা এবং সামাজিক রীতিনীতি ছাড়াও পুতুলগুলি মানুষের বিশেষ করে শিশুদের দেখা জিনিসের গড়ন সম্পর্কে সচেতন করবার উপকরণ হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করত। শিশু বয়স থেকে অসংখ্য বিচিত্র ধরণের পুতুল দেখে, হাতে ধরে এবং ভেঙ্গেচুরে এবং জোড়া লাগাবার চেষ্টা করে রূপ বা গড়নের বৈচিত্র্য সম্পর্কে

যে ধারণা জন্মাত তা আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের হওয়া দুষ্কর। বাজারের কেনা পুতুলের অনুপ্রেরণা থেকে শিশুদের নিজের হাতে পুতুল গড়বার উৎসাহ জন্মাত। এতেও আকৃতির বিশিষ্টতা সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিপুষ্ট হত, সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় রূপের নানা বিশিষ্টতার রস গ্রহণের পক্ষে এই অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিমেয়। আজকের পুতুল বাজার ছেড়ে সংগ্রহশালার আধারে সযত্নে স্থান সংগ্রহ করেছে। দূর থেকে তার রূপানুধ্যান এবং রস গ্রহণ করতে হয়। এতে পুতুলের মর্যাদা বেড়ে থাকলেও সমাজ তাতে লাভবান হয় নি; সমাজে ব্যাপকভাবে পুতুলের প্রচলনের অবসানের ফলে বিশেষ করে শিশু সমাজের যে ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ করা সহজ নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Auden, Sheila—Dolls and Toys, Art in Industry, Vol. II, Number, 2, March, 1951,

2. Chatterji, T. M—Alpona, 1948. Modern India Press, Calcutta,

3. Das, S. R—Folk Religion of Bengal, Part—I, No. 1, Calcutta, 1953.

4. Dutt, G. S—The Living Traditions of Folk-Arts in Bengal, Vol. X, No. 1, 1936.

5. Dutt, G. S—The tigers' God in Bengal Art, Modern Review, August, 1939, Calcutta.

6. Dutt, G. S—India Civilisation Forms and Motifs in Bengali Culture, Two Parts, Modern Review, Nov. 1939, Feb. 1940.

7. Dutt, G. S—Dolls and Figure Toys of Bengal, IAC, Vol. I, No. 1, Calcutta.

8. Dutt, G. S—Patua Sangit, Calcutta, 1939.

9. Dutt, G. S—The Art of the Kantha, Modern Review Oct. 1939, Calcutta.

10. Dutt, G S—The Indigenous Painters of Bengal, JISOA, Vol. I, No. 1, Calcutt

11. Dutt, G. S—Painted Saras of Rural Bengal, JISOA, Vol. II, 1934, Calcutta.

12. Ghosh, D. P—An Illustrated Ramayana Manuscript of Tulsidas and Parts from Bengal, JISOA, Vol. XIII, 1945, PP. 100-138.

13. Ganguli, K. K—Kantha the enchanted wraps, Indian Folk-Lore, Vol. I. No, II, 1958, PP. 3-10.

14. গুপ্ত, এ—যমপুকুর ব্রতের প্রাচীনতা প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৩৬।

15. Kramisch—'Kantha'—JISOA, June – Dec., 1939.

. 16. Kramriach—'Kantha'-Marg, Vol. 3, No. 2.

17. Mitra, S. C—On the Cult of the Maritime Deities in Lower Bengal Proceedings of the 15th Indian Science Congress, Calcutta, 1928.

18. Mookerjee, A—Folk Art of the Lower Ganges, Asia, Jan. 1941, New York.

19. Mookerjee, A—Folk Art of Bengal, 2nd. ed. University of Calcutta, 1946.

20. Nag, J. K—Folk Art of women in Bengal, Proc. of the 22nd. Indian Science Congress, Calcutta, 1935.

21. Ray, S. K—Primitive Statuettes of Western Bengal, JAC., Vol. II, No. 1, Calcutta.

22. Ray, S. K—The Artisan Castes of West Bengal and their craft (edited by A. Mitra) Census, 1951, West Bengal PP. 293-350.

23. অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত

নির্ঘণ্ট